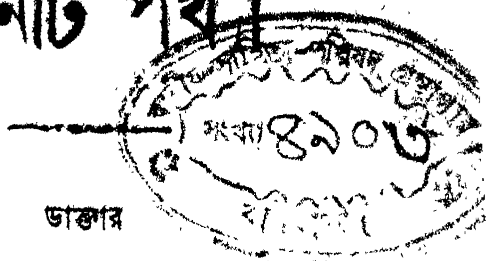
ধর্ম্মের

তিনটি পথ



ডাক্তার

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য-প্রণীত

ও প্রকাশিত।

[পাইগাছি, পোঃ সিগুড়া, হুগলী]

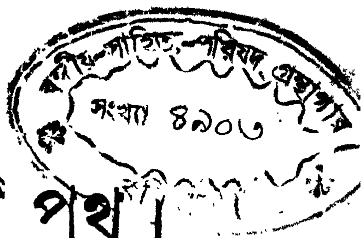
বাণীপ্রেস,

৬৩ নং নিমতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

জে, এম, দে দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২০

মূল্য ৵০ আনা।



তিনটি পথ।

অনাদি কাল হইতে জগতে মানবের জন্ম ও মৃত্যু হইয়া আসিতেছে; এ পর্য্যন্ত ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই ও হইবে না। জন্ম হইলেই যে মৃত্যু হয়, ইহা মানবমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি আস্তিক, কি নাস্তিক, সকলেই, জন্ম হইলেই যে মৃত্যু হয়, ইহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন—কেহই অস্বীকার করেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যু।" জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চয়। আমরা যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন মৃত্যু অবধারিত; ইহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু জানি না, কখন, কোন্ বয়সে, কোন্ সময়ে এই সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

অধিকাংশ মানব এই ধ্রুব বিষয় হইতে চক্ষু ফিরাইয়া রাখে। কিন্তু যখন মৃত্যু বলপূর্ব্বক তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার পরম প্রিয়জনকে লইয়া যায়, তখন সে আর চক্ষু ফিরাইয়া রাখিতে পারে না। তখন তাহার জীবনে একটা বৈরাগ্যের ছায়া আসিয়া পড়ে। কিন্তু এই বৈরাগ্য বেশী দিন থাকে না। এই বৈরাগ্য বাহ্য পদার্থ হইতে উৎপন্ন; আত্মার প্রতি স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতিগত-অন্তর্নিহিত তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইতে উৎপন্ন নহে। কাজেই, ইহা বিষয়-সৌন্দর্য্যের অভাবে ক্ষীণ হইতে হইতে লোপ

হইয়া যায়। এই বৈরাগ্যকে লোকে শ্মশান-বৈরাগ্য বলিয়া থাকে। ঐ শ্মশান বা ক্ষীণ বৈরাগ্য যতক্ষণ বা যতদিন বিষয়-সৌন্দর্য্যের আভায় একেবারে নিবিয়া না যায়, ততক্ষণ বা ততদিন মানবের অন্তর্নিহিত গভীর মহৎ তত্ত্ব সকলের কথঞ্চিৎ (যতটুকু পারা যায়) শিক্ষা করিয়া লওয়া উচিত ও কর্ত্তব্য।

এই সময় কাহারও কাহারও মনে মৃত্যুর বিষয়ে একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। তখন সে জিজ্ঞাসা করে, আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি ও কোথায় যাইব? মৃত্যু কি? মৃত্যুর পরপারে কি আছে? মৃত্যুর পর আমার কিছু অবশিষ্ট থাকিবে কি না? যদি থাকে, তবে কি থাকিবে? কোথায় থাকিবে? এবং কি অবস্থায় থাকিবে? পৃথিবীতে এমন কেহ দূরদর্শী আছেন কি না, যিনি ইহার যথার্থ উত্তর দিতে পারেন। মৃতব্যক্তি কোন্ শক্তি দ্বারা কিরূপে আবার এই জগতে আসিয়া থাকে। "জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জন্ম" এই যে চক্রের ন্যায় আবর্ত্তন, ইহার হাত হইতে কোন প্রকারে অব্যাহতি পাওয়া যায় কি না? যদি পাওয়া যায়, তবে তাহার উপায় কি? এই মহৎ উপায় বলিয়া দিতে পারেন, এমন লোক পৃথিবীতে আছেন কি না? যদি থাকেন, তবে কোথায় আছেন?

আমরা ঈশ্বরের শক্তি বা তাঁহার অতি ক্ষীণ কণামাত্র, অর্থাৎ তাঁহার সেই অসীম চৈতন্যশক্তি হইতে উৎপন্ন। যদি তাঁহার অংশই হই, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছি; আবার তাঁহাতেই পর্য্যবসিত হইব। তাঁহার অংশ বা কণা যতক্ষণ তাঁহাতে না যাইবে, ততক্ষণ গত্যন্তর নাই। সূর্য্য যেমন নিজ রশ্মি দ্বারা পৃথিবীকে উত্তপ্ত করেন, এবং সমস্ত উত্তাপটুকু যথাসময়ে

সূর্য্যেতেই ফিরিয়া যায়, তদ্রূপ ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি, আবার তাঁহাতেই মিলিতে হইবে। যতদিন বা যতকাল মিশিতে না পাইব বা না পারিব, ততদিন বা ততকাল জন্ম মৃত্যু অনিবার্য্য। মৃত্যু আর কিছুই নহে, স্থূলদেহের ধ্বংসমাত্র। যখন দেহ 'আমার' বলিয়া উল্লেখ হইয়া থাকে, তখন দেহ হইতে যে আমি একটা পৃথক পদার্থ, ইহা ও সহজেই অনুমান কর যায়; কিন্তু অনুভব করিতে হইলে, উপলব্ধি করিতে হইলে, প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, সাধনার প্রয়োজন।

এই সাধনা কি এবং তাহার উপায় কি, জানিতে পারিলেই আমাদের যথেষ্ট মঙ্গল হইয়া থাকে।

নিতান্ত নীচ পশু হইতে উচ্চ মানব পর্য্যন্ত সকলেই সুখী হইতে চাহে; সকলেই সুখ খুঁজে। কিন্তু কি উপায়ে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়, জানিতে ও বুঝিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ খুঁজিয়া বেড়ায়! কেহ অর্থ লইয়া, কেহ বিষয় লইয়া, কেহ স্ত্রী লইয়া, কেহ পুত্র লইয়া, কেহ ইন্দ্রিয়গণের আজ্ঞাধীন থাকিয়া, তাহাদের সেবা করিয়া, সুখী হইতে চেষ্টা করে; কিন্তু সে সেই সমুদয় অনিত্য বস্তুতে সুখ না পাইয়া বলে, "আমার ভ্রম হইয়াছে"; তখন সুখের প্রকৃত স্থান কোথায়, এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু কেহ কখন সুখ চাহি না বলিয়া পশ্চাৎপদ হয় না; কারণ সুখের অন্বেষণই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ও একমাত্র অবলম্বন। সুখী হইবার ইচ্ছা ঈশ্বর-প্রদত্ত। ঈশ্বরই আমাদের সুখের জন্য আমাদিগকে ব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা জীবমাত্রেরই অসাধ্য. কিম্বা কেবল ইচ্ছা বলিয়া নহে—মানবের আত্মার অন্তর্নিহিত প্রকৃতিগত স্বভাব।

যেমন জল মাত্রেরই প্রকৃতিগত স্বভাব সমুদ্রে মিশিবার গুণ-বিশিষ্ট; যেমন প্রত্যেক ঘটস্থ, পটস্থ, গৃহস্থ আকাশ অনন্ত আকাশে মিশিবার গুণ বা স্বভাববিশিষ্ট, তদ্রূপ আমাদের আত্মাও সেই সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মায় মিশিবার অন্তর্নিহিত প্রকৃতিগত গুণবিশিষ্ট।

মাতার কোল পাইবার জন্য ক্রন্দনশীল শিশুকে যদি অন্য কোন স্ত্রীলোক কোলে করে, তবে প্রথমে তাহাকে মাতা মনে করিয়া শান্ত হয় বটে, কিন্তু যখন সে নিজের মাতা নহে বলিয়া চিনিতে পারে, তখন আবার দ্বিগুণ কাঁদিতে থাকে; যতক্ষণ নিজের মাতাকে না পায়, ততক্ষণ তাহার ক্রন্দনও থামে না। তদ্রূপ আমাদের আত্মা যতক্ষণ বা যতদিন সেই সগুণবিশিষ্ট পরমাত্মাকে না পায়, ততক্ষণ বা ততদিন অনুসন্ধানে নিবৃত্ত হয় না ও প্রকৃত সুখীও হইতে পারে না।

এই সুখের অনুসন্ধান হইতে আমরা ঈশ্বরকে পাইব, ঈশ্বরে যাইব বা তৎসদৃশ হইব; ইহাই শেষ ফল। যেমন, একটী বীজ মাটিতে পুঁতিলে অঙ্কুরিত হয়, গাছ হয়, মুকুলিত হয়, ফুল হয়, আবার ফল হয়,—সেই ফলই ঈশ্বর। তখন আর আমার আমিত্ব থাকিবে না, আমি তিনি হইয়া যাইব; তখন ক্ষুদ্র কূপের জল বৃহৎ সমুদ্র-জলে মিশিয়া যাইবে। ইহাই শেষ ফল।

মৃত্যু কি, বলিতে হইলে, দেহের বিষয় একটু আলোচ্য। আমরা যে দেহ দেখিতে পাই, তাহা বাদে আরও কতকগুলি দেহ আমাদের আছে। যাহা দেখিতে পাই, তাহাকে অন্নময় কোষ কহে। ইহা অন্নাদি দ্বারা অর্থাৎ স্থূল পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে নির্ম্মিত, এইটিই আমাদের স্থূল শরীর। আমরা যে মৃত্যু দেখিতে

পাই, তাহা এই অন্নময় কোষ বা স্থূলদেহের ধ্বংস মাত্র। ইহার অভ্যন্তরে প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় কোষ আছে; ইহাকে সূক্ষ্ম-শরীর বা লিঙ্গশরীর কহে। ইহা সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন। ঐ মনোময় কোষ দুই ভাগে বিভক্ত। নিম্নাংশ—বাসনা বা কামনা দেহ, আর উচ্চাংশ—ভাবনা দেহ।

ইহার মধ্যে আর একটি শরীর আছে, তাহার নাম আনন্দময় কোষ; ইহাকে কারণ শরীর কহে। নিম্নে ইহার তালিকা দিলাম।

অন্নময় কোষ ... ... স্থূলশরীর।

প্রাণময় কোষ মনোময় কোষ বিজ্ঞানময় কোষ	বাসনাদেহ ভাবনাদেহ	সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর।

আনন্দময় কোষ ... ... কারণশরীর।

প্রাণময় কোষে দশ ইন্দ্রিয়ের তন্মাত্র, পঞ্চপ্রাণ, মন আর বুদ্ধি এই সতেরটি সংযুক্ত।

উক্ত স্থূলদেহের নাশকে আমরা মৃত্যু বলিয়া থাকি। স্থূলদেহ অর্থাৎ অন্নময় কোষ খসিয়া গেলে, সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ বাসনা-দেহ ও ভাবনা-দেহ লইয়া ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞান বা নিদ্রিত হইয়া পড়ি। এই বাসনা-দেহ মনোময় কোষের স্থূলাংশ দ্বারা ও ভাবনা-দেহ মনোময় কোষের সূক্ষ্মাংশ দ্বারা নির্ম্মিত। নিদ্রা-ভঙ্গের পর ইহ-জগতের পরিবর্ত্তে আমরা আর একটি জগৎ দেখিতে পাই। তাহাকে ভুবর্লোক কহে। ইহাকে সচরাচর প্রেতলোক বা কামলোক কহিয়া থাকে। প্রেত অর্থে ইহ-জগৎ হইতে প্রস্থিত ব্যক্তির গমনের স্থান। ইহাতে বাসনা বা কামনার

অজস্র দারুণ যাতনা সকল ভোগ হয়; তজ্জন্য ইহাকে কামময় লোক কহে। ভুবর্লোকের নিম্নাংশ বা স্থূলাংশই প্রেতলোক, আর উচ্চাংশ বা সূক্ষ্মাংশকে পিতৃলোক কহিয়া থাকে। প্রেতলোকে উপস্থিত ব্যক্তির স্থূলদেহ থাকে না বটে, অথচ মনের বৃত্তিগুলি স্পষ্ট বা পরিস্কার থাকে—বুদ্ধির কোন পরিবর্ত্তন হয় না। ভূর্লোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে যেমন ছিল, এখানেও ঠিক তেমনি থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রবৃত্তিগুলি প্রবল আকার ধারণ করিয়া ভীষণ যাতনা দিতে থাকে।

পরস্ব-অপহারক অপহরণ প্রবৃত্তির ভীষণ তাড়নায়, ঘাতক আঘাতের জ্বালায়, প্রতারক প্রতারণার দুর্দ্দমনীয় জ্বালায়, দারুণ যাতনা ভোগ করিতে থাকে।

পেটুক ক্ষুধার প্রবল তাড়নায়, কামুক কামের জ্বালায়, ধনভোগী ধন সঞ্চয়ের প্রবল ইচ্ছায় মাতাল মদ্যপানের দুর্দ্দমনীয় লালসার ভীষণ যাতনায়, জর্জ্জরিত হইয়া ছট্ ফট্ করিতে থাকে।

এইরূপ অসংখ্য পাপী অসংখ্য পাপের পৃথক পৃথক শাস্তি ভোগ করিতে থাকে। কিন্তু ভোগ্যবস্তুর অভাব, এবং ভোগের যন্ত্রস্বরূপ স্থূলদেহেরও অভাব; সুতরাং তাহার কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা সবিশেষ অনুভব করা আমাদের মত লোকের অসম্ভব।

এইরূপে প্রেতলোকে কিছুকাল ভুগিতে ভুগিতে তাহার কামনা সকল ক্ষীণ হইয়া যায়। তখন কামনাদেহের কতকগুলি পরমাণু ঝরিয়া যায়। এই ভোগকাল সকল ব্যক্তির সমান নহে। যে ব্যক্তি যত আসক্তিসহকারে ঐ সকল কুকার্য্য বা কুচিন্তা করিয়াছে, তাহার ভোগকাল ততই অধিক এবং ততই যাতনা-

দায়ক। মনে কর, কোন একটি তানপুরার তার যদি বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে তাহার স্পন্দন বা ঝঙ্কার জোরে হয় ও অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। আর যদি অল্প টানিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে তাহার ঝঙ্কার ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। তদ্রূপ যে, যে প্রবৃত্তি, যে চিন্তা বা যে কার্য্য যত আসক্তি সহকারে চালনা করিয়াছে, তাহার ভোগকাল ততই বেশী ও ততই সাংঘাতিক যন্ত্রণাদায়ক। আর যিনি কর্ত্তব্যের খাতিরে, কাহারও দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে করিয়াছেন, তাহার ভোগকাল ও যন্ত্রণা অল্প।

বাসনা-দেহের কতকগুলি পরমাণু ঝরিয়া যাওয়ার পর, সে পিতৃলোকে উন্নীত হইয়া থাকে। এখানেও বাসনা থাকে বটে, কিন্তু সেগুলি অপেক্ষাকৃত ভাল চিন্তা। মান, সম্ভ্রম, যশঃ, প্রতিপত্তি, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি যে সকল বিষয়ে তাহার আসক্তি বা বাসনা ছিল, সেইগুলি জাগিয়া উঠে। এই সকল লাভের জন্য, তখন সে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। কিছুদিন পরে এইগুলিও ক্ষীণ হইয়া পড়ে; তখন দ্বিতীয়বার মৃত্যু হয়; তৎপরে সে ভাবনাদেহ লইয়া স্বর্গে (স্বর্লোকে) গমন করে। বাসনাদেহটী কামলোকে পড়িয়া থাকে।

স্বর্গে তাহার নিঃস্বার্থ দয়া, ভক্তি, পরোপকার ইত্যাদি সংগুণ সকল জাগিয়া উঠে। তাহাতে স্বার্থের লেশমাত্র থাকে না। কাজেই অতুল আনন্দে বিভোর হইয়া পরম সুখে সুখী হইয়া থাকে। এইরূপে কিছুকাল কাটিলে, তাহার ভাবনা-দেহ খসিয়া যায়, অর্থাৎ তৃতীয়বার মৃত্যু হয়। তখন আরও উচ্চতম স্বর্গে গমন করে; কিম্বা যাহাদের কারণ শরীর সুগঠিত ও

কর্ম্মক্ষম হয় নাই, তাহাদের ভোগের জন্য পুনর্ব্বার পৃথিবীর দিকে গতি হয়। অতঃপর পূর্ব্বসঞ্চিত বাসনা-বলে স্বর্গলোক ও ভুর্ল্লোক ভেদ করিয়া এবং সেই সেই উপাদানে গঠিত একটী নূতন দেহ লাভ করিয়া, আবার কর্ম্মফলভোগের জন্য পৃথিবীতে নিজের উপযুক্ত মাতা-পিতার ঔরসে ও বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগ করে, এবং পুনর্ব্বার নূতন নূতন কর্ম্মে নিযুক্ত হয়।

প্রেতলোকে এই সকল যন্ত্রণার হ্রাস করিবার জন্য ও ঊর্দ্ধ-গমনের পথ সহজ করিবার জন্য শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা আছে। মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের এই কার্য্য সাধনের জন্য কেবল উপাসনাদির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে ঋষিগণ কেবলমাত্র উপাসনা-আদির ব্যবস্থা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তৎসহ মন্ত্র নিয়োজিত করিয়া সেই পথ আরও সুগম করিয়াছেন। ইহাতে উপাসনার মানসিক শক্তি ও মন্ত্রশক্তি দুইপ্রকার বল নিয়োজিত হওয়ায়, উক্ত ক্রিয়া উৎকৃষ্ট-রূপে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যদি পুরোহিত ও যজমান ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও জ্ঞানী হন, তবে ঐ কার্য্যে যথোচিত ফললাভ হইয়া থাকে। তদ্বিপরীতে পুরোহিত ও যজমান মিথ্যাবাদী, অশিক্ষিত অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞানশূন্য, মূর্খ, অধার্ম্মিক, অজ্ঞানী ও এ বিষয়ে অবিশ্বাসী হইলে বিশেষ কোন ফল দর্শে না, অতি অল্প ফল দর্শে, কিম্বা বৃথা হয়। প্রেতদেহ মোচনের জন্য আদ্যশ্রাদ্ধাদি এবং ভাবনাদেহ মোচনের জন্য সপিণ্ডকরণাদির ব্যবস্থা আছে। দয়াময় ঋষিগণ মানব দুঃখে কাতর হইয়া কি না করিয়াছেন ও করিতেছেন? তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করা আমাদের অসাধ্য হইলেও সেই ঋণ-মোচনের

অতি সহজ ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা এতই অকৃতজ্ঞ যে, সেই সামান্য কার্য্য দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ও নিজের মঙ্গলের পথ পরিষ্কার করিতে আলস্য, ঔদাস্য ও তাচ্ছিল্য করিয়া থাকি।

পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের স্মৃতি না থাকিলেও সংস্কার থাকে। স্মৃতি ও সংস্কার প্রায় একই জিনিষ। স্মৃতি নষ্ট হইয়া তাহার একটা যে দাগ থাকে, তাহারই নাম সংস্কার। যেমন কেহ কোন পরিচিত ব্যক্তির নাম ভুলিয়া গেলে, যদি তাহার অযথার্থ নাম উল্লেখ করা যায়, তবে সে একেবারেই অস্বীকার করে। মনে কর, সেই ব্যক্তির নাম 'নগেন্দ্র', যদি তাহার স্মরণার্থ কেহ 'হরি' নাম উল্লেখ করে, তবে সে একেবারেই অস্বীকার করে, কিন্তু দেবেন্দ্র বা যোগেন্দ্র নাম উল্লেখ করিলে, সে বলে, ঐ প্রকারের বটে, দেবেন্দ্র নহে, যোগেন্দ্রও নহে, কিন্তু ঠিক ঐ প্রকারের। পরে 'নগেন্দ্র' বলিলে সে একেবারে আনন্দের সহিত মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। ইহারই নাম সংস্কার। স্মরণ ছিল না বটে, কিন্তু নামের একটা দাগ ছিল, তাই অযথার্থ নামোল্লেখে অস্বীকার করিতেছিল, এবং যথার্থ নাম শুনিবামাত্র আহ্লাদিত হইল, স্মরণ হইল, ইহারই নাম সংস্কার।

মানব পূর্ব্বজন্মের চিন্তা-গঠিত-স্বভাবের সংস্কার লইয়া জন্ম-গ্রহণ করে। বহুদিনের অভ্যাসই স্বভাব। জন্মের পর হইতেই ভিন্ন ভিন্ন বালকের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হইতে দেখা যায়। মনো-যোগ পূর্ব্বক দেখিলে একত্রে খেলাপরায়ণ দুই তিনটী বালককে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট দেখা যায়। একজন দয়া, স্নেহ, সরলতা-মাখান শান্ত, ধীর; আর অন্যটী নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, ক্রুর প্রকৃতি-

বিশিষ্ট দুষ্ট ও অস্থির; দুইজনই শিশু, কিন্তু কত বিভিন্ন! ইহা তাহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত না বলিয়া কি বলিব? ইহাতে অনুমান করা যায় যে, যে পূর্ব্বজন্মের চিন্তা দ্বারা যেমন স্বভাব গঠন করিয়াছিল, সে তাহাই লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বজন্মে যে, যে বিষয় শিক্ষা করিয়াছিল, সে তাহা সহজে বুঝিতে পারে এবং সহজে ও অক্লেশে শিক্ষা করিতে পারে; শিক্ষক ভ্রমে পতিত হইলে, তাহার প্রতিবাদ করিতেও সে কুণ্ঠিত হয় না।

বহুদিন ধরিয়া চিন্তা, ভাবনা, অভ্যাস দ্বারাই স্বভাব গঠিত হয়। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" আমাদের দৈনিক চিন্তা দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবনের প্রকৃতি গঠিত হইতেছে। সুতরাং পরজন্মকে নিজের মনের মত করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে। নীচ ও হেয় বিষয়ের চিন্তা কর, নীচ ও হীন প্রকৃতির হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। সদা উচ্চ চিন্তা, সদাচরণ, পরদুঃখে কাতর, পরের মঙ্গল চিন্তা, পরকে শান্তিদানে জীবনযাপন কর, উচ্চ হইয়া জন্মিবে। ইহাই বিধির বিধান বা ঈশ্বরের নিয়ম; ইহাই প্রকৃতির কার্য্য; কখন ইহার অন্যথা হইবে না; কখন ইহার ব্যতিক্রম হইবে না।

বাসনা।—এজন্মে অত্যন্ত অর্থকামী হও, পরজন্মে অর্থ পাইবে। যে বিষয়ের জন্য ঐকান্তিকী কামনা হইবে, পরজন্মে তাহাই পাইবে। কিন্তু অর্থ হইলেই সুখী হওয়া যায় না। এমন অনেক লোক দেখা যায় যে, বহু অর্থের মালিক হইয়াও নানা কারণে ভীষণ মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। আবার তৎসহ কর্ম্মফল নির্ভর করে।

কর্ম্মফল।—এ জন্মে যে যেমন কর্ম্ম করিবে, পরজীবনেও সেই মত পাইবে। লোককে সুখী করিয়া থাক, সুখী হইবে; কষ্ট দিয়া থাক, কষ্ট পাইবে। অর্থদান করিয়া থাক, প্রচুর অর্থ পাইবে। পরের দুঃখে কাতর হইয়া থাক, মানসিক সুখে সুখী হইবে।

সুতরাং চিন্তা, কামনা ও কর্ম্ম এই তিনটী পরজীবনের উন্নতি-অবনতির আশ্রয়। এবারে যেমন করিয়া যাইবে, যেরূপ চিন্তায় মনকে যেমন গড়িয়া লইবে, পরজীবন সেইরূপে নিয়মিত হইবে। এ জীবনে যেমন কামনা করিয়া যাইবে, যেমন কর্ম্ম করিবে, পরজীবন সেইরূপে গঠিত, নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।

জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু অনন্তকাল ধরিয়াই যে আমরা এই চক্রে ভ্রমণ করিব, তাহাও নহে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ জন্ম-মৃত্যুর হাতে পড়িতে পড়িতে ক্লান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিব এবং পরিত্রাণের জন্য, পরম সুখের জন্য, পরম শান্তির জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িব। আমরা সকলেই সুখের অনুসন্ধান করিতেছি; কিন্তু সুখের অন্বেষণে বিপথে পড়িয়া দিশাহারা হইয়াছি, বিফল-মনোরথ হইয়া যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িব, তখনই যথার্থ সুখ-লাভের ইচ্ছায় মুক্তির পথ অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি আসিয়া পড়িবে।

কোন ব্যক্তির পিতা তাহাকে সন্দেশ কিনিয়া আনিবার জন্য দুইটী টাকা দিয়াছিল। সে ময়রার দোকানে যাইতে যাইতে পথপ্রান্তে এক মদের দোকান দেখিয়া চারি আনার মদ খাইল, তখন তাহার নেশা হওয়ায়, ময়রার দোকানের পথ

ভুলিয়া নানা অন্যান্য দ্রব্যের দোকানে সন্দেশ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু কোন দোকানে না পাইয়া যখন কাতর হইল, তখন কোন দয়াবান্ পথপ্রদর্শক পথিকের অনুগ্রহে দোকান পাইয়া চরিতার্থ হইল। আমাদেরও মায়া দ্বারা সেই অবস্থা হইয়াছে, সুতরাং খুঁজিতেছি বটে, কিন্তু প্রকৃত সুখের দোকান ভুলিয়া নানা স্থানে সুখের অন্বেষণ করিতেছি। যখন কোথাও প্রকৃত সুখ না পাইয়া কাতর হইয়া পরম সুখের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইব, তখনই গুরুর দর্শন লাভে চরিতার্থ হইব।

মহাত্মাগণ, গুরুগণ সদাই আমাদের উন্নতির জন্য ব্যস্ত আছেন, সদাই আমাদের সতর্ক করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের সেই সঙ্কেত বা বাক্য শুনিতে পাই না। সে সুরে আমাদের মন বাঁধা নাই, তাই শুনিতে পাই না; তাই বুঝিতে পারি না। তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হইলেও পরম্পরা সম্বন্ধে অর্থাৎ নিজে দর্শন না দিয়া, নিজ মুখে উপদেশ না দিয়া, অপরের দ্বারা অদৃশ্যে, পশ্চাতে থাকিয়া সৎপথে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন। তাঁহার সেই সঙ্কেত আমরা অনেক সময় উপেক্ষা করি এবং ধরিতে না পারিয়া অসৎপথে যাইয়া বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ি। আমরা যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকি, ততই আমাদের এই সকল সঙ্কেত-অনুভব শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। আবার যতই আমাদের উন্নতি হয়, ততই আমাদের সূক্ষ্মদেহের অনুভূতি বা চৈতন্যশক্তি বৃদ্ধি হওয়ায়, সামান্য সামান্য বিষয়ের আঘাত দ্বারা সূক্ষ্মদেহ স্পন্দিত হইতে থাকে; কাজেই অনুভবশক্তিও বৃদ্ধি হইতে থাকে। সেই আঘাতজনিত

স্পন্দন অস্থি সাবধানে সহ্য করিতে হয়, অর্থাৎ উৎকণ্ঠিত না হইয়া স্থির, ধীরভাবে পূর্ব্ব-জন্মকৃত কর্ম্মফল সকল ভোগ দ্বারা শেষ হইয়া যাইতেছে, বুঝিয়া সুখী হইতে হয়। যতই উন্নতির পথে যাওয়া যায়, পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল সকল ততই শীঘ্র শীঘ্র আসিতে থাকে। যে সকল দুরদৃষ্টের ফল পাঁচ সাত জন্মে শেষ হইত, তখন তাহা দুই এক জন্মেই শেষ হইতে থাকে। এইজন্য অনেক সময় দেখা যায়, ধার্ম্মিক ব্যক্তি নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন; ইহা তাঁহার শীঘ্র শীঘ্র উন্নতির কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যখন শিষ্য হইবার সৎগুণগুলি আমাদের হয়, অর্থাৎ শিষ্য হইবার উপযুক্ত হই, তখন গুরু আর স্থির থাকিতে পারেন না—নিজে আসিয়া দর্শন দিয়া চরিতার্থ করেন। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্তই আমাদের শিক্ষা করিতে হয়, এবং সদা সতর্ক থাকিয়া বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা কোন্‌টী কর্ত্তব্য ও কোন্‌টী অকর্ত্তব্য; কর্ত্তব্য মধ্যে আবার কোন্‌টী বেশী কর্ত্তব্য, কোন্‌টী কম কর্ত্তব্য, এই সকল বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে হয়। এই কর্ত্তব্য বিষয়কে সাধারণে ধর্ম্ম কহে।

ধর্ম্ম কাহাকে কহে?

ধৃ-ধাতু নিষ্পন্ন পদ ধর্ম্ম। ধৃ-ধাতুর অর্থ ধরা; যাহা ধরিয়া মনুষ্য বাঁচিয়া থাকে বা যাহা ধরিয়া পরমাত্মা নিজের অবস্থায় আসিতে পারেন, তাহাই ধর্ম্ম। পাতঞ্জল দর্শনে আছে—

"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেবস্থানম্।"

যাহা ধরিয়া পরমাত্মা নিজ অবস্থায়—নির্ব্বিকার অবস্থায়

আসিতে পারেন অর্থাৎ পরমাত্মাই ঈশ্বর, তিনি জীবরূপে নবদ্বারযুক্ত দেহে বদ্ধ হইয়াছেন; যাহা ধরিয়া—যাহা করিয়া, সেই আত্মা বদ্ধাবস্থা ঘুচিয়া নিজ অবস্থায় আসিতে পারেন, সেই সমস্ত কার্য্যকে ধর্ম্ম কহে। ধর্ম্মের লক্ষণ দশ প্রকার;—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীঃ বিদ্যা সত্যমক্রোধ দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥

ধৃতি—ধৈর্য্য ধারণ। ক্ষমা—দোষীর দোষ না দেখা বা মহত্ত্ব হেতু উপেক্ষা করা। দম্—কর্ম্ম সংযম, ইহা অন্তরের সহিত করিতে হইবে, জোর করিয়া কার্য্য বন্ধ করিলে হইবে না। অস্তেয়—চুরি না করা। পাতঞ্জল দর্শনে আছে;—

অস্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্।

অস্তেয—অচৌর্য্য, ইহা একেবারে হৃদয়ের সহিত ভুলিলে তাঁহার নিকট সকল রত্ন উপস্থিত হয় বা সর্ব্ব রত্ন প্রাপ্তির তৃপ্তি লাভ হয়। শৌচ—শুদ্ধতা।

"শৌচাৎ স্বাঙ্গ জুগুপ্সা পরেরসঙ্গশ্চ।"—পাতঞ্জল।

শৌচ দুই প্রকার—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক। বাহ্যিক শৌচ করিতে করিতে আভ্যন্তরিক শৌচ সিদ্ধ হয়। তখন জুগুপ্সা অর্থাৎ শরীরের প্রতি ঘৃণা আসে, শরীরের প্রতি আদর থাকে না, সুতরাং মরণের ভয় থাকে না। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ—কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বশীভূত করা; ইহা করিতে পারিলেই সন্তোষ আপন আপনি আইসে।

"সন্তোষোদনুত্তমঃ সুখলাভঃ।"—পাতঞ্জল।

সন্তোষ সিদ্ধ হইলেই সদানন্দাবস্থা আইসে, অর্থাৎ উপমা-রহিত আনন্দ সদাই মনে বর্ত্তমান থাকে। ধীঃ—বুদ্ধি

চিত্তশুদ্ধিবোধ—ভালমন্দ জ্ঞান, নিত্য ও অনিত্য বস্তুর জ্ঞান। বিদ্যা—বিদ ধাতু অর্থ জ্ঞান, এই জ্ঞান অধ্যয়ন-লব্ধ জ্ঞান নহে, লেখাপড়া নহে, ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞান। সত্য—মিথ্যা ভুলিয়া যাওয়া, কেবল মিথ্যা কহিব না বলিলে চলিবে না; মিথ্যাকে একেবারে ভুলিতে হইবে।

"সত্য প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়া ফলাশ্রয়ত্বম্॥"—পাতঞ্জল।

সত্য হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা হইলে, অনুষ্ঠিত কার্য্য সকলের ফল নিজের অধীন হয় এবং বাক্‌সিদ্ধ হয়। অক্রোধ—ক্রোধ না থাকা, রাগ মন হইতে দূর করা; ক্রোধ উন্নতিপথের কণ্টক। এই দশটি সাধন-পথের সম্বল; এইগুলি সাধনা হইলে তবে সাধন পথের পথিক হওয়া যায়—শিষ্য হইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া যায়। এই ধর্ম্মের পথ তিনটি। প্রত্যেক সাধককে এই তিন পথের কোন পথ অবলম্বন করিতে হয়। যিনি যে পথ সুবিধা বোধ করেন, তিনি সেই পথেই যাইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু গন্তব্যস্থানের নিকটবর্ত্তী হইলেই আর পথ পৃথক্ থাকে না—স্বতন্ত্র থাকে না—একত্র হইয়া যায়। তখন আর কেহ কাহাকে বিভিন্ন পথাবলম্বী দেখেন না। তখন সকলেই এক উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া, পরস্পর সাহায্য পাইয়া যাইতে থাকেন। তখন আর হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি পৃথক জ্ঞান থাকে না; ভেদভাব থাকে না; দ্বেষভাব থাকে না। এই সময় তাঁহাদের অনেক কর্ত্তব্য আসিয়া পড়ে, পৃথিবীর অনেক কার্য্য তাঁহাদের করিবার ভার পড়ে। যাউক, এক্ষণে সেই তিনটি পথ কি, তাহাই দেখা যাউক।

১। কর্ম্ম। ২। জ্ঞান। ৩। ভক্তি।

এই সকল পথকে মার্গ এবং যোগও কহে।

১। কর্ম্মমার্গ বা কর্ম্মযোগ।

২। জ্ঞানমার্গ বা জ্ঞানযোগ।

৩। ভক্তিমার্গ বা ভক্তিযোগ।

এক্ষণে এই তিনটি পথ কিরূপ। তাহাই সংক্ষেপে সাধ্যমত বলিব। ধার্ম্মিক মহোদয়গণ নিজগুণে, নিজের মহত্ত্বের জন্য আমার ভ্রম থাকিলে সংশোধন করিয়া লইবেন।

এই তিন পথাবলম্বীকেই প্রাণপণে অভ্যাস করিতে হয়। অতএব অভ্যাস এই তিন পথাবলম্বীরই অবলম্বন জানিবে।

১। কর্ম্মযোগ।

যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। কর্ম্ম তিন প্রকার ;— ১। বৈধ-কর্ম্ম বা কর্ম্ম। ২। বিকর্ম্ম। ৩। অকর্ম্ম।

বেদে যে কর্ম্মের বিধি আছে, তাহাই বৈধ-কর্ম্ম বা কর্ম্ম। এই সকল কর্ম্ম কামনার সহিত করিলে শুভাদৃষ্ট হইয়া স্বর্গাদি ভোগ হইয়া থাকে। বৈধ-কর্ম্ম, যথা—ঋষি-ঋণ শোধ জন্য সন্ধ্যা-বন্দনাদি। পিতৃ-ঋণ শোধ জন্য সংসারী হইয়া পুত্রোৎপাদন ও শ্রাদ্ধাদি এবং দেব-ঋণ শোধ জন্য যজ্ঞাদি। ভগবান্ গীতায় ৩।১৩ বলিয়াছেন, যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন সকল পাপ হইতে মুক্ত করে, আর যে নিজের জন্য পাক করে, সে দুরাচার পাপই ভোজন করে। বিহিত কর্ম্ম না করা বিকর্ম্ম। আর যে কর্ম্মের নিষেধ আছে, তাহাই নিষিদ্ধ কর্ম্ম বা অকর্ম্ম।

এই শেষ দুই প্রকার কর্ম্ম করিলে দুরদৃষ্ট উৎপন্ন হয়। আর বৈধ-কর্ম্ম সকাম হইলে শুভাদৃষ্ট উৎপন্ন করে। শুভাদৃষ্ট দ্বারা

স্বর্গাদি ভোগ ও চিত্তশুদ্ধি হয়, পরে আবার জন্ম হয়। কামনাযুক্ত সৎকর্ম্ম দ্বারাও বন্ধন অনিবার্য্য। ভগবান বলিয়াছেন—সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া কর্ত্তব্যবোধে যিনি কর্ম্ম করেন, তিনি কর্ম্মী হইলেও প্রকৃত সন্ন্যাসী। কারণ, তিনি কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মফল তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে না। জ্ঞানীব্যক্তির যেরূপ মুক্তি হয়, নিষ্কাম কর্ম্মীরও তদ্রূপ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। কর্ম্মত্যাগীর জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। কর্ম্মের দ্বারা যাঁহার চিত্ত পবিত্র হইয়াছে, ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়াছে, তিনিই সাধন-পথের পথিক।

ইন্দ্রিয় দুই প্রকার ;—১। কর্ম্মেন্দ্রিয়, ২। জ্ঞানেন্দ্রিয়।

কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার ;—১। বাক, ২। পাণী, ৩। পাদ, ৪। পায়ু ৫। উপস্থ।

জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার ;—১। চক্ষু, ২। কর্ণ, ৩। নাসিকা, ৪। জিহ্বা, ৫। ত্বক্। আবার ইহাদের তন্মাত্র পাঁচটি। আর মন, বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত অন্তরেন্দ্রিয় এই চারিটি। এই সকল ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া অর্থাৎ সকল জীবের হিতে রত থাকিয়া, কর্ম্মের ফলত্যাগ দ্বারা কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্ম কখনই বন্ধনের হেতু অর্থাৎ কর্ম্মের কারণ হয় না, বরং জ্ঞান ও মুক্তির হেতু হয়। ভগবান্ (৬।৫ গীতায়) বলিয়াছেন,—

উর্দ্ধরেদাত্মনাত্মনং নাত্মানমবসাদয়ং।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥

আপনিই আপনার বন্ধু ও আপনিই আপনার শত্রু। কেহ কাহারও বন্ধু বা শত্রু নহে। যিনি মনকে বশীভূত করিয়াছেন,

তিনিই তাঁহার বন্ধু. আর যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয়, সে নিজেই নিজের শক্র। অতএব আত্মাদ্বারা আত্মাকে উর্দ্ধে রাখিবে, অধঃপাতিত করিবে না।

নিজের উন্নতি করিতে হইলে অগ্রে জগতের উন্নতি করিতে হইবে; অন্যথায় নিজের উন্নতির আশা নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ১১।৫৫ ॥

যে ব্যক্তি আমাকে পরম-পুরুষার্থ জানিয়া, আমাতে ভক্তি পূর্ব্বক আমার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, ইন্দ্রিয়-বিষয়ে অনাসক্ত এবং সর্ব্বজীবে সমদর্শী হন, তিনিই আমাকে পান।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই—১। তাঁহার কর্ম্ম কি? ২। কিরূপে তৎপরায়ণ হওয়া যায়? ৩। কি প্রকারে তাঁহাতে ভক্তিমান্ হওয়া যায়? ৪। সঙ্গবর্জ্জিত কাহাকে কহে? ৫। সর্ব্বজীবে নির্ব্বৈরতাই বা কি?

১। তাঁহার কর্ম্ম—সৃষ্টির পালন। কি প্রকারে তাঁহার সেই পালন-কার্য্যের সহায়তা করা যায়? কেহ কেহ বলিবেন, আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র; আমাদের দ্বারা তাঁহার পালন-কার্য্যের কি সহায়তা হইবে? ইহা ভ্রম; কারণ, তিনি কিছুই করেন না; সমস্তই তাঁহার শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া অন্যের দ্বারা হইয়া থাকে। যেমন রাজকার্য্যের কোন কাজই রাজা নিজ হস্তে করেন না, তাঁহার নিয়োজিত নিয়ম দ্বারা লাট, বেলাট, কমিশনার, জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট্ ইত্যাদি কর্ম্মচারী দ্বারা হইয়া থাকে; তাঁহার কার্য্যেরও এইরূপ বন্দোবস্ত—উচ্চতর হইতে

নিম্নতর পর্য্যন্ত অসংখ্য দেবতা, মহাত্মা, ঋষি ও মনুষ্য দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

বৃক্ষগণ পাতা দিয়া বায়ুমণ্ডল হইতে জীবের দূষিত ত্যাজ্য বিষ (কার্ব্বনিক্-এসিড বাষ্প) গ্রহণ করিয়া নিজেদের কাষ্ঠ উপাদান সংগ্রহ করিয়া থাকে। যদি একটা বৃহৎ বৃক্ষের একটি ডালে, একটি পাতায় বা একটি মূলে জলসেচন করা যায়, তবে সেই বৃহৎ বৃক্ষের কি একটুও সাহায্য করা হয় না? একটি পাতার, একটি মূলের সাহায্য করিলে সেই বৃক্ষের কিছু না কিছু কাষ্ঠ উপাদান সংগ্রহের সাহায্য করা হইয়া থাকে। সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী জীবসমষ্টিই ঈশ্বর। একটি জীবের সেবায় ঈশ্বরের সেবা কেন না হইবে? কারণ, ঈশ্বর সর্ব্বময়, সর্ব্বব্যাপী। মুণ্ডক উপনিষদে আছে—

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ—
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥ ২।১॥

সমস্ত জীব একমাত্র তিনিই বিভিন্নরূপে প্রকাশমান। যেমন, বৃহৎ অগ্নিরাশির অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর বিবিধ আকারে জীবরূপে প্রকাশমান। মুণ্ডকোপনিষদে আছে,—

ব্রহ্ম বেদমমৃতম্ পুরস্তাৎ
ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধ ঊর্দ্ধতশ্চ প্রসৃতং
ব্রহ্ম বেদম্ বিশ্বরূপম্ বরিষ্ঠম্॥ ২।১১॥

অর্থাৎ বেদস্বরূপ ব্রহ্ম সম্মুখে (পূর্ব্বে) পশ্চাতে, দক্ষিণে,

উত্তরে, অধঃ ও ঊর্দ্ধে প্রসারিত হইয়া বিশ্বরূপে প্রকাশমান্। সমস্ত দৃশ্যবস্তুতে, সমস্ত চরাচরে তাঁহাকে দেখিতে শিখিলে, অন্তরের সহিত ভক্তিভাবে তাঁহাকে সর্ব্বময় দেখিতে শিখিলেই ভক্তিমান্ হওয়া যায়।

আবার যখন লয় হইবে, সমস্তই সেই পরাৎপরে লীন হইবে, আর অন্যগতি নাই, অন্য স্থান নাই, মহাত্মা হইতে মহাপাপী পর্য্যন্ত তাঁহাতেই যাইবে। কিন্তু যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত, তাঁহারা তৎপূর্ব্বেই তাঁহাকে পাইবেন।

অদৃশ্য কীটাণুকীট হইতে বৃহদাকার জীব, ক্ষুদ্র শৈবাল হইতে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ, এই অদৃশ্য ধূলিকণা হইতে বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র যা কিছু দেখিতেছি, সমস্তই তিনি ভিন্ন আর কিছু নহে, সমস্তই তাঁহার অংশমাত্র। ধূলি-কণা হইতে ব্রহ্মাণ্ড, যাহার অন্ত নাই, সীমা নাই, আমাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধিতে যাহার ধারণা হয় না, এ সমস্তই তিনি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এই জ্ঞানদৃঢ় হইলেই তৎপরায়ণ হওয়া যায়।

বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন যে, আমাদের চিন্তাশক্তির আকার আছে, বর্ণ আছে, চিন্তা করিবামাত্র তাহা কোন সূক্ষ্ম পদার্থে নীত হইয়া ক্রমে ক্রমে দূরস্থ হইতে থাকে। যে দ্রব্য যত স্থূল, তাহা বহন করিতে স্থূল যানের প্রয়োজন; সূক্ষ্ম বস্তু বহনের যানও সূক্ষ্ম পদার্থের দ্বারা হইয়া থাকে। শব্দ সূক্ষ্মবস্তু, তাহার বহনকর্ত্তা সূক্ষ্মবায়ুমণ্ডল। আলো আবার শব্দ অপেক্ষা সূক্ষ্ম, তাহার বহনকর্ত্তা বায়ু অপেক্ষা সূক্ষ্ম ইথর। চিন্তা আবার আলো অপেক্ষা সূক্ষ্ম, সুতরাং ইথর অপেক্ষাও কোন সূক্ষ্ম বস্তুর দ্বারা বাহিত হয়। আবার যে বস্তু যত স্থূল, তাহা বহিয়া লইয়া

যাইতে অধিক সময় লাগে। শব্দাপেক্ষা আলো সূক্ষ্ম বলিয়া আলো শীঘ্র বাহিত হয়।

মনের চিন্তা আবার তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম, বাহক ইথর অপেক্ষাও সূক্ষ্ম পদার্থ। ইহার গতি আরও শীঘ্র। যাঁহারা পৃথিবীর আদিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চিন্তাস্রোত আজও ব্রহ্মাণ্ডের শেষসীমায় পৌঁছায় নাই। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ যে, ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড !!!

জ্যোতির্ব্বিদ্গণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, সূর্য্য, পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দলক্ষগুণ বড়; অনেক দূরে থাকার জন্য আমরা এত ছোট দেখি! এতদূর হইতে সূর্য্যরশ্মি পৃথিবীতে আসিতে কেবলমাত্র ৭ মিনিট লাগে; অনেক নক্ষত্র এতদূরে আছে যে, পৃথিবীর সৃষ্টি হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত সেই সকল নক্ষত্রের আলো আজও পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারে নাই। তবে ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড !!! এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তার উপকার !!! আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, আমার দ্বারা সেই ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টিকর্ত্তার উপকার !!! কি অদ্ভুত কথা !!! অদ্ভুত নহে। তাঁহার উপকার নহে, আমার নিজের উপকার; আমি তাঁহার, তাই তাঁহার কার্য্যে যোগদান আমার কার্য্য।

বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমাদের একটি অঙ্গুলিতে যে পরিমাণ রক্ত আছে, সেই রক্তটুকুর মধ্যে সাত হাজারশত জীব আছে; এক্ষণে আমার সমস্ত শরীর কত জীবের সমষ্টি ভাবিয়া দেখ! ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমার শরীর ক্ষুদ্র ধূলিকণা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র; আবার আমার দেহস্থ একটি জীবের তুলনায় আমার শরীর প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-

সদৃশ। একটি মানবের সেবা করিলে সেই দেহস্থ কত জীবের সেবা করা হয়; একটি মানবকে বাঁচাইতে পারিলে কত জীবের প্রাণদান করা হয়। একটি মানুষকে খাইতে দিলে কত অসংখ্য জীবের আহার যোগান হয়। যিনি একটি মানুষকে খাইতে দেন, তিনিও বহুপালক। যুধিষ্ঠির ভীমকে বলিয়াছিলেন, ভীম! দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিও না। দুর্য্যোধন বহুপালক, তাহার মস্তক উৎকৃষ্টতর ঐশীশক্তিযুক্ত। তাই বলি, যদি নিজ উন্নতির ইচ্ছা থাকে, যদি নিজ উন্নতির চেষ্টা থাকে, তবে প্রাণপণে পরোপকার কর। নিঃস্বার্থভাবে জীবের, পরের সেবা কর। একটি জীবের, একটি মানুষের সেবা করিলেও সেই পরমপুরুষেরই সেবা করা হইবে। তখন তিনিই আমাদের অপেক্ষা উন্নত মনুষ্যদ্বারা, আমাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিবেন, উন্নতি করিয়া দিবেন, অসীমবলে বলীয়ান করিয়া দিবেন। যদি তখন সেই নিজ উন্নতির প্রতি না তাকাইয়া—সেই উন্নতি, সেই বল, পরের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করিতে পারি, তবে তিনি কোলে তুলিয়া লইবেন। যেমন সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত মাতা ক্রন্দনশীল শিশুকে খেলার দ্রব্য দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়া নিজ গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হন; কিন্তু যদি সেই শিশু সেই প্রাপ্ত খেলনা না লইয়া কাঁদিতে থাকে, তবে মাতা তাহাকে কোলে তুলিয়া লন; সেইরূপ ঈশ্বরদত্ত-ঐশ্বর্য্য যদি পরের জন্য ব্যয় করিয়া অবোধ শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিতে পারি, তবেই সেই কোল পাইব। পার্থিব প্রলোভনে না ভুলিয়া স্বতঃপরতঃ মঙ্গল প্রার্থনা, সর্ব্ব জীবের উপর দয়া, সকলের উপর প্রেম-বিতরণই -সেই

কোন পাইবার প্রথম পথ, প্রথম সোপান বা প্রশস্ত উপায়।

গীতায় (১৭।২০) ভগবান বলিয়াছেন,—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥

উপকারের আশা না রাখিয়া, দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় যে দান তাহাই সাত্ত্বিক দান।

পরোপকারই আমাদের উন্নতির একমাত্র পথ। ইহাই তাঁহার কার্য্যে যোগদান। মহাত্মাগণ গুরুগণ, নিজের মুক্তি ত্যাগ করিয়া, জগতের হিতের জন্য, জীবের মুক্তির জন্য সর্ব্বদাই উৎসুক আছেন; সদাই ডাকিতেছেন, এসো ভাই এসো, এসো বাবা এসো; আর কষ্ট পাইও না। আমরা শুনিতে পাই না; আমরা পাপী, সে সুরে মন বাঁধা নাই, সে সুরে শ্রবণশক্তি বাঁধা নাই, তাই শুনিতে পাই না; তাই এত অবনতি। গুরুর অভাব নাই, কিন্তু শিষ্য নাই। অনেকে বলেন, গুরু পাই না; তাঁহারা নিজে কিছু করিতে পারিবেন না, গুরু সমস্ত করিয়া দিবেন; ধর্ম্ম, যোগ, মুক্তি, গুরু আসিয়া তাঁহার কমণ্ডলু হইতে বাহির করিয়া ঢক্ করিয়া গিলাইয়া দিবেন। গুরু পথ-প্রদর্শকমাত্র, পথ দেখাইবেন; নিজেকে পথ পরিষ্কার করিতে হইবে এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার উপদেশ মত চলিতে হইবে। কর্ম্ম, অভ্যাস, জ্ঞান ও ভক্তিতে নিপুণ হইলে, তবে শিষ্য হইবার উপযুক্ত হয়, অন্যথায় অজ্ঞান শিশুর হস্তে দুই পাশ ধারাল—দুই মুখ সুঁচাল অস্ত্র দিলে শিশুর যে দশা হয়, অনুপযুক্তকে দীক্ষা দিলেও তাহার ঠিক সেই দশা হয় এবং

তজ্জন্য গুরুরও প্রত্যবায় আছে। তাই দয়া করিয়া গুরুগণ আমাদের তাহা দেন না। উপযুক্ত হইলে শিষ্যকে গুরু খুঁজিয়া লইতে হয় না; গুরুই শিষ্য খুঁজিয়া লয়েন, ডাকিয়া লয়েন, আনন্দের সহিত দেখা দেন, কোলে তুলিয়া লন; এবং উপযুক্ত হইলেই অদ্ভুত ক্ষমতা সকল দিয়া থাকেন বা সেই সকল ক্ষমতা পাইবার উপায় বলিয়া দেন। তাই তুলসিদাস বলিয়াছেন,—

গুরু মিলে বহুৎ বহুৎ।
চেলা মিলে না এক॥

গুরুগণ, মহাত্মাগণ নিজের হস্তস্থিত মুক্তি ত্যাগ করিয়া, নিজেদের সুখ ত্যাগ করিয়া, মুক্তিকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, আমাদের মঙ্গলের জন্য ব্যাকুল, ব্যস্ত; আর আমরা নিস্তব্ধভাবে, নিঃশঙ্ক চিত্তে কতকগুলি দুরদৃষ্ট প্রস্তুত করিতেছি। নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতে আসিয়া আবার কতকগুলি কর্ম্ম প্রস্তুত করিতেছি। একটি আগাছার মূল উৎপাটন করিতে আসিয়া কত অসংখ্য আগাছার বীজ ছড়াইয়া ফেলিতেছি। ভাবিলাম না যে, জীবন কতক্ষণ, কি করিতেছি, কাহার জন্য করিতেছি, এখনি মরিতে হইবে; এখনি কামলোকে যাইতে হইবে, দারুণ যন্ত্রণাভোগ করিতে হইবে; যাহা করিতেছি, তাহাই সহ্য করিতে হইবে; যে চক্ষে যাহাকে দেখিতেছি, সেইরূপে অপরের দৃশ্যপথে আসিতে হইবে। আবার জন্ম হইবে, আবার কর্ম্মফল সকল ভোগ করিতে হইবে। যেরূপ ব্যবহার লোকের সঙ্গে করিতেছি, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। একবার ভাবি না, একবার মনেও করি না, মনে হইলে মুখ ফিরাইয়া লই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিকর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা দুরদৃষ্ট উৎপন্ন

হয়; দুরদৃষ্টের ফল দুঃখভোগ। আর বৈধকর্ম্মে শুভাদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহার ফল সুখভোগ। অতএব বৈধকর্ম্ম করিলে সুখভোগ জন্য স্বর্গবাস, তৎপরে পুনর্জন্ম অনিবার্য্য। কিন্তু কর্ম্ম-ফলত্যাগী কর্ম্মীর কর্ম্মফল দগ্ধবীজবৎ, অর্থাৎ ভাজাবীজের যেমন অঙ্কুর উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে না, তদ্রূপ ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য কর্ম্মীরও কর্ম্মফলে তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে না। পাতঞ্জলে আছে,—"দগ্ধ বীজ বচ্চেৎ।"

অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্মফল দগ্ধবীজের ন্যায় থাকে মাত্র। সুতরাং কর্ম্মফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—

শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২।১২॥

অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান হইতে কর্ম্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, এইরূপ ত্যাগ হইতে শান্তি হইয়া থাকে। যাঁহার কিছুই আকাঙ্ক্ষা নাই, তিনি কর্ম্মী হইলেও প্রকৃত সন্ন্যাসী ও নিষ্ক্রিয়; কারণ তিনি কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মফল তাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারে না। এই ত্যাগ মুখে শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু বলিলেই হইবে না—আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইতে হইবে। এটি আমাদের মুখের কথা নহে—প্রাণের সহিত, অন্তরের সহিত, প্রতি ক্ষণে, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি পলে করিতে হইবে। হাড়ে হাড়ে প্রত্যেক বিষয়ের ফলত্যাগী হইতে হইবে। শ্রুতি-প্রতিপাদিত যজ্ঞাদি কর্ম্মের ফল—স্বর্গাদি বাস; এমন কি, মোক্ষেচ্ছা পর্য্যন্ত ত্যাগ হইবে। ইহাকেই বশীকার বৈরাগ্য কহে। ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ ইচ্ছা একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। এই

ভোগের দোষ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিলে তবে বৈরাগ্য আসিবে। নচেৎ যে ভোগলালসা অভ্যাস হইয়াছে, ইহা ত্যাগ করা বড়ই কঠিন। প্রতিক্ষণে দোষ অনুভব করিতে হইবে। অন্যথায় জোর পূর্ব্বক বন্ধ করিলে সেই কু-অভ্যাস কোন সময় জোরে আক্রমণ করিবে।

জ্ঞানীব্যক্তির মুক্তি যেমন অনায়াসলভ্য, নিষ্কাম কর্ম্মীরও মুক্তি তেমনি সহজসাধ্য ; কিন্তু কর্ম্মফল মনে মনে রাখিয়া মুখে ত্যাগ করিলে হইবে না। আবার কর্ম্মত্যাগীর জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। কর্ম্মের দ্বারা যাঁহার চিত্ত পবিত্র হইয়াছে, ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়াছে, মন সংযত হইয়াছে, নিজের আনন্দে নিজে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তিনিই সাধন-পথের পথিক, তিনিই সৎগুরু দর্শনের উপযুক্ত পাত্র। ভগবান পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন,—কর্ম্ম কর, কর্ম্ম-ফলে যেন আশা না থাকে।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ গী ২।৪৭॥

কর্ম্মে তোমার অধিকার হউক, কর্ম্মফলে যেন আসক্তি না হয়। ইহাই সঙ্গ-বর্জ্জিত।

ভগবান ২।৪০ গীতায় বলিয়াছেন—

নেহাতিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

নিষ্কাম কর্ম্মে বিফলতা নাই, বিঘ্নও নাই, অল্পমাত্র ধর্ম্মও মহাভয় হইতে রক্ষা করে। তবে ভয় কি ? তবে আর কেন সকাম কর্ম্ম করিয়া, পাপ করিয়া, বাসনাকে প্রশ্রয় দিয়া, যে আগাছার বন আমাকেই পরিষ্কার করিতে হইবে, তাহা আর

বৃদ্ধি করি? যাহা করিয়াছি, অম্লানবদনে, আনন্দিতমনে তাহাই পরিষ্কার করি।

অতএব কুকর্ম্ম ভুলিয়া সৎকর্ম্মে, ঈশ্বরের কর্ম্মে, যথাশক্তি যোগ দাও। যথাশক্তি পরোপকারে মন দাও। অর্থ দিয়াই যে উপকার করিতে হইবে এমন নহে; যাহার অর্থ নাই, সে কোথা পাইবে? শরীর, মন, বাক্যের দ্বারাও অনেক উপকার করা যায়। মনে মনে পরের মঙ্গল ইচ্ছা করিলেও সৎকার্য্য করা হয়। অন্যথায় কিসে পরের মন্দ হইবে, এই চিন্তা ত্যাগ করিয়া কিসে পরের মঙ্গল হইবে, এই চিন্তা করা সদা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মানবের উপকার করিলে ভদ্রলোকে তাহা ভুলিয়া যায় না, ঈশ্বর কি ভুলিয়া যাইবেন? যদি ভুলিয়া জান, আরও ভাল হয়, কোল পাইবার সম্ভাবনা হয়। সাধ্যমত দুঃখীর দুঃখমোচন, ধর্ম্মপিপাসুকে ধর্ম্মজ্ঞান দান, নিজের দুঃখ ভুলিয়া পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া, ইহাই তাঁহার সৃষ্টিপালনের সহায়তা করা; আর সর্ব্বজীবে অহিংসাই বৈরত্যাগ। তবে এই অহিংসা হৃদয়ে হৃদয়ে অন্তরের সহিত ত্যাগ করিতে হইবে। পতঞ্জলি বলিয়াছেন;—

অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।

মনে মনে, অন্তরে অন্তরে, হাড়ে হাড়ে, মর্ম্মে মর্ম্মে অহিংসা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে, তাহার নিকট বৈরত্যাগ হয় অর্থাৎ জগতে আর তাঁহার শত্রু থাকে না। হিংস্রজন্তুও তাঁহার নিকট আসিয়া হিংসা ভুলিয়া যায়। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন;—

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১২।১০।

অভ্যাসে অসমর্থ হইলে, আমার কর্ম্ম কর, কেবল আমার জন্য কর্ম্ম করিলে মোক্ষ হয়। ইহাই তাঁহার কর্ম্ম।

ভগবান ২।৪৯ গীতায় বলিয়াছেন ;—

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।

বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥

হে ধনঞ্জয়! জ্ঞান যোগ অপেক্ষা, কাম্যকর্ম্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট। ফলাকাঙ্ক্ষী মানব কৃপণ অর্থাৎ হেয়। তুমি কর্ম্মযোগের দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন কর, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন হয়।

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।

কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ গী, ৩।৫॥

কেহই কোন অবস্থায় ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতি অর্থাৎ সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ গুণ নিজ নিজ বশে আনিয়া সকলকে অবশ করিয়া কার্য্য করায়।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ গী ৩।৬॥

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া বন্ধ করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল মনে করিতে থাকে, সেই বিমূঢ়াত্মাকে কপটাচারী বলা যায়।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।

কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমশক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ গী ৩।৭॥

যিনি মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করেন, যিনি ফল-কামনাহীন, তিনিই প্রশংসার যোগ্য। অতএব কর্ম্ম আমাদের অত্যাজ্য। সুতরাং কর্ম্মের ফলত্যাগী হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।

এক্ষণে চিন্তার কথা কিছু বলিব। আমাদের প্রত্যেক চিন্তার একটি একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপ ও বর্ণ আছে। যে চিন্তার যেমন ভাব ও যেমন প্রকৃতি—সেই চিন্তার তেমনি বর্ণ ও তেমনি আকৃতি। ভক্তি—নীলবর্ণ; জ্ঞান—পীত ও প্রীতি গোলাপী। এইরূপ এক এক ভাবের এক এক বর্ণ। প্রত্যেক চিন্তা বা ভাবের মূর্ত্তিও নানাপ্রকার; কোনটি গোলাকার, কোনটি ফুলের আকার, কোনটি মুকুটের ন্যায়, কোনটি খড়্গাকৃতি, কোনটি শুণ্ডাকৃতি; এইরূপ অসংখ্য চিন্তার অসংখ্য আকার। সে সকল অপার্থিব অদ্ভুত-মূর্ত্তির বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। ক্রোধে উন্মত্ত ব্যক্তির চিন্তাশক্তির মূর্ত্তির চিত্র রক্তবর্ণ কৃপাণের ন্যায়। কোন পরমভক্ত ঈশ্বরে ভক্তিভাবে আত্মসমর্পণ করিলে যে ভাবের উদয় হয়, তাহার চিত্র নীল-পদ্মসদৃশ। এই ছবিটির কথা মনে পড়িলে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের রাবণবধ জন্য ৺ দুর্গাপূজার নীলপদ্মের কথা মনে পড়ে। এই-রূপ ভক্তিই সিদ্ধিলাভের শ্রেষ্ঠ উপকরণ। চিত্রগুপ্তের খাতায় অর্থাৎ ভুবর্লোকে আমাদের সকল চিন্তা প্রতিক্ষণই প্রতিফলিত হইতেছে। চিত্রগুপ্ত অর্থাৎ গুপ্তচিত্র।

পরহিতচিন্তা প্রভৃতি উচ্চ বা ভালচিন্তা সকল মূর্ত্তি ধারণ করিবার সময় স্বর্লোক হইতে নিজের অনুরূপ সূক্ষ্ম উপাদান সংগ্রহ করে। কাম, ক্রোধ, লোভ আদি অতি নীচশ্রেণীর চিন্তার ভাব সকল স্বর্লোক অপেক্ষা নিম্ন জগৎ ভুবর্লোক হইতে উপাদান লইয়া অঙ্গ গঠন করে। চিন্তা যতই নিম্নশ্রেণীর হয়, যতই সকাম হয়, যতই স্বার্থকলুষিত হয়, ততই তাহার অঙ্গ স্থূল হইতে স্থূলতর হইতে থাকে।

পূর্ব্বেই দেহ সকলের বিষয় বলা হইয়াছে। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, আপন, সমান, উদান, ব্যান), মন ও বুদ্ধি, এই সতেরটি একত্রিত হইয়া সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর গঠিত হয়।

প্রকৃতির কারণ যে অজ্ঞান, ইহাকেই অবিদ্যা কহে। এই অবিদ্যা হইতে আমাদের কারণ-শরীর উৎপন্ন হয়।

অন্নাদি দ্বারা পুষ্ট যে দেহ, তাহাই অন্নময়কোষ, ইহাই দৃশ্য শরীর অর্থাৎ স্থূলদেহ।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন লইয়া মনোময়কোষ হয়। এই মনোময় কোষের অন্য নাম কামময় দেহ; পূর্ব্বোক্ত নীচ শ্রেণীর চিন্তার স্থান কামময় দেহ। আমাদের মনে যতই চিন্তার উদয় হইতেছে, ততই আমাদের কামময় দেহে, তাহা স্বমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে। কামময় দেহকে ভাল করিতে হইলে, পবিত্র করিতে হইলে, সকল কুচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সচ্চিন্তা করিতে হয়। কুচিন্তাই আমাদের পরম শত্রু। লোকে অনিষ্টকারীকে শত্রু মনে করিয়া ঘৃণা করে; কিন্তু কুচিন্তার ন্যায় শত্রু আর নাই; সুতরাং কুচিন্তাকে পরম শত্রু জ্ঞানে ঘৃণা করিয়া একেবারে ত্যাগ করিবে। এইস্থলে একটি গল্প বলিতে হইল।

কোন দীনদরিদ্র তাহার দীক্ষাগুরুকে কহিল,—গুরুদেব! আপনার আদেশমত তপস্যাদি করা আমার অসাধ্য, কারণ আমার সদাই সকল বিষয়ের অভাব, সদাই নাই আর নাই, কাজেই জপাদি করিবার সাবকাশ পাই না। গুরু কহিলেন, বাবা! একটি চাকর রাখিতে পার, তাহা হইলে আর কোন

অভাব থাকে না। সে তোমার সকল অভাব পূরণ করিবার ক্ষমতাযুক্ত। যখন যে অভাব হইবে, বিনা বিনিময়ে সে তাহা আনিয়া যোগাইবে। লোকটার দোষ এই যে, সে কখনই বসিয়া থাকিতে পারে না; যখনই কাজ দিতে না পারিবে, তখনই তোমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত খাইবে। সে, কার্য্যের বিচার না করিয়া সকল কার্য্যই করে; কোন কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত বা অপারগ নহে।

যখন কোন কার্য্য তাহার অকরণীয় নহে এবং অসাধ্য কিছুই নাই, তখন সমস্ত দিনের উপযুক্ত কার্য্য দেওয়া অসম্ভব নহে, মনে করিয়া লোভের বশীভূত হইয়া শিষ্য গুরুর নিকট হইতে চাকর লইয়া গেল। বাটীতে লইয়া গিয়া সে বিপদ্‌গ্রস্ত হইল, কারণ যে সকল কার্য্য শত শত লোকে বহু কষ্টে বহু দিনে সম্পন্ন করিতে পারে না, সে সেই সকল কার্য্য ক্ষণেকের মধ্যে সুসম্পন্ন করিয়া পুনরায় কার্য্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। তখন শিষ্য আর কার্য্য সংকুলান করিতে না পারিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত ও প্রাণভয়ে ভীত হইয়া গুরুর নিকটে আসিয়া, চাকর ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন গুরু দয়া করিয়া কহিলেন—বাবা! চাকর আর ছাড়িবে না। তবে এক উপায় আছে কর, এবার কার্য্য চাহিলেই তাহাকে একশত আটটি গাঁটওয়ালা একটি বাঁশ আনিয়া মাটিতে পুঁতিতে বলিবে এবং অন্য কার্য্য না পাওয়া অবধি ঐ বাঁশ দিয়া উঠিতে ও নামিতে কহিবে। ঐ চাকরই আমাদের মন, আর একশত আটটি গাঁটওয়ালা বাঁশ জপের মালা। মালা ছাড়িলেই কুচিন্তা আসিবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চিন্তা যত নীচ হয়, কু হয়, তাহার অঙ্গও ততই স্থূল হয়। চিন্তার স্বভাব এই যে, নিজের প্রকৃতির মত

আধার খুঁজিয়া লয়। কুচিন্তা মনোময় কোষের উচ্চস্তরে স্পন্দনোৎপন্ন করিতে পারে না। আর সচ্চিন্তা ভুবর্লোকের অপেক্ষাকৃত স্থূল উপাদান দ্বারা বাহিত হওয়া সম্ভব নহে; স্বর্লোকের সূক্ষ্ম উপাদান দ্বারা বাহিত হইয়া থাকে। চিন্তা যত সৎ হয়, তাহা বহিয়া লইয়া যাইবার যানও ততই সূক্ষ্ম হওয়া দরকার হয়, সুতরাং যিনি যত উচ্চ চিন্তা করেন, তাহার কামময় দেহের নিম্নস্তর বা নিম্নাংশ তত অলসভাবে পড়িয়া থাকে; তাহাদের আলোচনার অভাবে তাহারা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে; এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চস্তরগুলি সর্ব্বদা স্পন্দিত হওয়ায় দিন দিন নির্ম্মল হইতে থাকে।

এই কামময় দেহের উপর আমাদের নিজের চিন্তা ব্যতীত অপরের চিন্তার প্রভাবও বড় কম নয়। আমরা যাহাদের সঙ্গে বা নিকটে থাকি, তাহাদের চিন্তাসকল আমাদের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা ভুবর্লোকে যে সকল তরঙ্গ উৎপাদন করিতেছে, সেগুলি আসিয়া আমাদের কামময় দেহকে নিরন্তর আঘাত করে। কিন্তু নিজের উপযুক্ত পাত্র পাইলেই তবে তাহাদের চেষ্টা বা কার্য্য সফল হয়, নতুবা বৃথা হইয়া যায়; অর্থাৎ যাহাদের কামময় দেহ নির্ম্মল বা সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত, তাঁহাদের উপর নিম্নশ্রেণীর চিন্তাস্রোতে কোন ক্ষতি করিতে পারে না; কেবল উচ্চশ্রেণীর চিন্তাই মিত্রভাবে তাঁহাদের মনমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের সচ্চিন্তার বলবৃদ্ধি করে। কিন্তু যাহাদের কামময় দেহ এখনও স্থূল আছে, তাহাদের সঙ্গে অপরের নিম্নশ্রেণীর চিন্তাগুলি অতিশয় ও ভয়ানক ক্ষতিকারক। এইজন্যই নীচ লোকের সংস্পর্শে থাকা উচিত নহে; বোধ করি, ইহাই

অবলম্বনে নীচ জাতির অন্নাদি খাওয়া বা নীচ লোকের বিছানায় শয়ন, উপবেশনাদি নিষেধ আছে। এই সকল নীচ প্রকৃতির লোক হইতে সদাই দূরে থাকা আমাদের উচিত। মন্দলোকেরা যে কেবলমাত্র কু-পরামর্শ দিয়া আমাদের মন্দ করে, তাহা নহে। অজ্ঞাতসারে আমাদের ভয়ানক অনিষ্ট করিয়া থাকে। তাহাদের কুচিন্তা সকল অজ্ঞাতসারে আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। তাই প্রবাদ আছে—"সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।" সত্য সত্যই সঙ্গদোষে সর্ব্বনাশ হয়। আর সৎসঙ্গে উন্নতি হইয়া থাকে।

২। জ্ঞান যোগ।

এই জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান নহে। এ জ্ঞান অধ্যয়নলব্ধজ্ঞান নহে, অপরা জ্ঞান নহে, পরা বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপনির্ণয়; জ্ঞান দুই প্রকার। শিক্ষালব্ধ জ্ঞানকে পরোক্ষজ্ঞান ও নিজে অনুভব করিয়া যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে অপরোক্ষ জ্ঞান কহে।

জগতে এমন লোক আছেন, যাঁহারা ভক্তির সাহায্য না লইয়া একেবারে জ্ঞানমার্গে থাকিয়া মুক্তির অধিকারী হইয়াছেন। যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, পরিণাম নাই—সেই অবিনাশী, নিত্য সৎস্বরূপ; তাঁহার নির্ণয় করা জ্ঞানের কার্য্য অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ং স্থির করাই জ্ঞানের কার্য্য ও প্রথম সোপান। সেই এক সৎস্বরূপ পুরুষ ব্যতীত আর কিছুই নাই, আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই, সকলই অনিত্য, বহুত্ব কিছুই নাই; আমরা অজ্ঞানতা বশতঃ বহু দেখি, প্রকৃত সবই এক, সেই এক, সবই এক, একই সব। তাই তুলসি দাস বলিয়াছেন,—

সব ভুল।

মালিক্য না ভুল ॥

সমস্তই মায়া-প্রসূত, ক্ষণিক অভিব্যক্তি মাত্র। এই একত্বের ভাব হইয়া যতক্ষণ বহুত্বের অভাব না হইবে,সে পর্য্যন্তই মানবকে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর হাতে পড়িতেই হইবে। কঠ উপনিষদে আছে।

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ ৪।১০ ॥

যিনি এখানে, তিনিই সেখানে; যিনি সেখানে, তিনিই এখানে। যে ব্যক্তি ইহাঁকে নানা দেখে, সে পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

মানবের আত্মা যে সবই এক. ইহা ঐকান্তিক চিন্তা দ্বারা অনুভব করিতে হইবে। জীবাত্মা জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্যই দেহে অধিষ্ঠিত হইয়া বহুকোষে আবদ্ধ হইয়াছেন যথা—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। জ্ঞানীব্যক্তি এই কোষ-গুলিতে একে একে মোচন করিয়া আত্মার সন্ধান করিবেন। জ্ঞানের ইহাই প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় সকলকে প্রশমিত ও বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাহা হইতে আত্মাকে প্রতিনিবৃত্ত করা, ইন্দ্রিয়গণকে নিজের ইচ্ছাধীন করা, বহির্জগতের বাধা হইতে দূরে থাকিয়া আত্ম-শক্তির কার্য্য অনুভব করা যাইতে পারে। এই সমস্ত বিষয়ের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন।

এই সমস্ত বিষয় কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাধনা করিতে হয়। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের কার্য্য বিশেষ-রূপে জানিয়া, আত্মশ্লাঘা রাহিত্ব, অদাম্ভিত্ব, অহিংসা, সহিষ্ণুতা,

সরলতা, গুরুসেবা, বাহ্য-অভ্যন্তর শৌচ, মনঃসংযম, বৈরাগ্য. অহঙ্কারশূন্যতা, জন্মমৃত্যু-জরা ব্যাধিতে দুঃখ ও দোষের অনুদর্শন, অনাসক্তি, ইষ্ট ও অনিষ্টে সমজ্ঞান, সর্ব্বদা আত্ম-দৃষ্টি, একান্ত-ভক্তিমান, নির্জ্জনে বাস, ও মনুষ্য-সমাজে বিরাগ, তত্ত্বজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের শেষ ফল সন্ন্যাস বা কর্ম্মত্যাগ এবং মোক্ষ এই বিংশতি প্রকার জ্ঞানে সাধন সমাহিত হয়, এবং ইহা ব্যতীত সমস্তই অজ্ঞান-মূলক জানিতে হইবে এবং উক্তগুলি একে একে সাধনা করিতে হইবে।

চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব যথা—পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ও ব্যোম), পঞ্চমহাভূতের তন্মাত্র পঞ্চ (যথাক্রমে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ) দশ ইন্দ্রিয়; কর্ম্মেন্দ্রিয়—(বাক্, পাণী, পাদ, পায়ু, উপস্থ)। জ্ঞানেন্দ্রিয়—(চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্), মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং মূল—প্রকৃতি।

এই সন্ন্যাসে যোগী ইন্দ্রিয় ও মনের বিষয় হইতে নিজেকে আত্মার অভিমুখী করেন। ইন্দ্রিয়ের বিষয়—স্থূল জগৎ, আর মনের বিষয়-সূক্ষ্ম জগৎ হইতে আত্মাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই যোগী জন-সমাজ ত্যাগ করেন, এবং আত্মার নিঃসঙ্গতা চিন্তা ও ধারণা দ্বারা মুক্তিলাভ করেন।

আবার সংসার ত্যাগ না করিয়াও সন্ন্যাস সাধিত হইতে পারে। কামনা ও আসক্তিবিহীন হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইতে হয় না, অর্থাৎ কর্ম্মফলত্যাগের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ হয় না; কিন্তু কামনা ও আসক্তি থাকিলেই জন্ম-মৃত্যু অনিবার্য্য। অবিদ্যা বা অজ্ঞানজনিত বিষয়-বাসনাই কামনা ও আসক্তি।

যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, মনের প্রত্যেক গতির উপর

প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছেন, এমন নিঃসঙ্গবান পুরুষই ব্রহ্মে প্রবেশের অধিকারী। কঠোপনিষদে আছে ;—

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসাসহ।

বুদ্ধিশ্চ বিচেষ্টতে তমাহুঃ পরমাঙ্গতিম্ ॥ ৬।১০ ॥

যখন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মাতে স্থির হইয়া থাকে, এবং বুদ্ধি কোন বাহ্যবিষয়ে আসক্ত না হইয়া কেবল সেই পরমাত্মার তত্ত্বানুসন্ধানে তৎপর থাকে, তখন বুদ্ধির সেই অবস্থাকে পণ্ডিতগণ পরমাগতি বলিয়া থাকেন। এই পরমাগতিই মনুষ্যকে ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ করিয়া প্রকৃত সুখের অধিকারী করে। ঈশোপনিষদে আছে,—

যস্মিন সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোকএকত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭ ॥

যখন যাঁহার, আত্মাতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হইয়াছে এই জ্ঞান হয়, তখন তাঁহার আর শোক ও মোহ থাকে না। তখন তিনি সকলকে আত্মবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

জ্ঞান দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়কার্য্য বন্ধ হয়। মহাদেব জ্ঞানময় বা জ্ঞানের সমষ্টি ; তাই মহাদেব মদন-নাশক।

মোটের উপর, জ্ঞানমার্গের চরম সীমা মুক্তি ; অর্থাৎ আত্মার চরম মহৎঅবস্থা। কিন্তু যতই জ্ঞানী হউন না কেন, কর্ম্ম করিতেই হইবে। আর ভক্ত ত কর্ম্মের জন্য মুক্তি পর্য্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করিবেন। (৩.২৫ গীতায়) ভগবান্ বলিয়াছেন ;—

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।

কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোক সংগ্রহম্ ॥

হে ভারত, কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তি যেমন কর্ম্ম করিবেন, কর্ম্মে অনাসক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি লোকদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার জন্য তেমনি কর্ম্ম করিবেন; অন্যথায় কেহই কর্ম্ম করিবে না; কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করেন, সকলেই সেই অনুকরণ করিয়া থাকে। আবার ভগবান্ গীতায় ৩।২৩ বলিয়াছেন ;—

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

যদি আমি অনলস হইয়া কর্ম্ম না করি, তবে সকল মানুষ আমার অনুকরণ করিবে। তাহা হইলে কর্ম্মলোপ হেতু অধর্ম্ম প্রচার হইবে। অতএব জ্ঞানীকেও কর্ম্ম করিতে হইবে।

আর জ্ঞান যে শ্রেষ্ঠ তাহাও ভগবান বলিয়াছেন।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥

গী ৪।৩৯॥

একনিষ্ঠ হইয়া ইন্দ্রিয় সংযম ও শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে, এবং জ্ঞান লাভ হইলেই শীঘ্র শান্তি প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু জ্ঞানীকেও কর্ম্ম করিতে হইবে। কারণ ভগবান গীতায় (৩।২৪) ইহাও বলিয়াছেন।—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥

আমি যদি কর্ম্ম না করি, তবে লোক সকল ধর্ম্মলোপ জন্য বিনষ্ট হইবে, এবং আমাকে বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইতে হইবে। অতএব তাঁহাকেও লোক সংগ্রহ অর্থাৎ লোকসকলকে কর্ম্ম করাইবার জন্য কর্ম্ম করিতে হইয়াছে। সুতরাং লোক শিক্ষার

অন্ত জ্ঞানীকেও কর্ম্ম করিতে হইবে। এই সঙ্গে ধ্যানযোগ অবলম্বন। কারণ গীতায় ১৩।২৪ আছে।—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।

অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥

কেহ কেহ ধ্যান যোগের দ্বারা আত্মাকে দেখেন, অন্ত কেহ কেহ সাংখ্যযোগ দ্বারা, কেহ বা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন। ইহাতেই বেশ বুঝা যায় যে, নিষ্কাম কর্ম্মে জ্ঞান লাভ হয়, তাই ভগবান নিষ্কাম কর্ম্মেরই পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন।—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ গী ৪।৩৭॥

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥ গী৪।৩৮॥

জ্বলন্ত অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ জ্ঞানাগ্নিও সকল কর্ম্মকে নষ্ট করে। জ্ঞান অপেক্ষা কিছুই নাই, সেই জ্ঞান কর্ম্ম দ্বারা লাভ করা যায়।

জ্ঞান লাভ করিলেই শান্তি লাভ হয়, কিন্তু সেই জ্ঞান আত্ম-শুদ্ধি দ্বারা লাভ করা যায় এবং কর্ম্মদ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।

যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ গী ৫।১১।

যোগীগণ কর্ম্মফলে আসক্তিশূন্য হইয়া, শরীর, মন, বুদ্ধি, ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা আত্মশুদ্ধির জন্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কর্ম্ম দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়। আত্মশুদ্ধি হইলে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়, বা জ্ঞানই মুক্তি।

এক্ষণে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্ম না করিলে জ্ঞান হইবার উপায় নাই, এবং জ্ঞান হইলেও কর্ম্ম করিতে হইবে। সুতরাং কর্ম্ম অত্যাজ্য।

সকলকেই কর্ম্ম করিতে হইবে, নিষ্কর্ম্মা থাকিবার উপায় নাই। জ্ঞানী আত্মশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম, আর অজ্ঞানী বন্ধনের হেতুভূত সকাম কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

৩। ভক্তি যোগ।

এই মার্গে তত্ত্বজ্ঞানকে একেবারে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। কারণ তত্ত্বজ্ঞান না হইলে জগতের হিতসাধন করিতে পারা যায় না। ভক্তিমার্গেরও উদ্দেশ্য পরমাত্মার সহিত মিলিত হওয়া, কিন্তু জ্ঞানলব্ধ একত্ব হইতে ভক্তিলব্ধ একত্বের কিছু পার্থক্য আছে। তত্ত্বজ্ঞান না হইলে, প্রেমদ্বারা যে লোক-হিত-ব্রত সাধিত হইবে, তাহা বিপথে পতিত হইতে পারে—হিত করিতে ভ্রমক্রমে অহিত সাধন হইয়া পড়িবে।

অতএব জ্ঞানহীন ভক্তি উৎকৃষ্ট নহে। কারণ, লোক-হিত-সাধন জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। আর ভক্ত-জীবনের সার পদার্থ—লোকের অতীব ও উৎকৃষ্ট মঙ্গল-সাধনা। ভক্তের চরম উদ্দেশ্য পরমাত্মার সহিত ভক্তের সম্মিলন, কিন্তু তাহা বলিয়া ভক্তের আত্মবিস্মৃতি প্রার্থনীয় নহে। পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন জীবে ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মারূপে প্রকাশিত।

যে পর্য্যন্ত সমস্ত জীবাত্মা এক পরমাত্মায় আসিয়া মিলিত না হয়েন, সে পর্য্যন্ত ভক্ত কাহাকেও বিস্মৃত হইবেন না। ভক্তি-

মার্গে প্রেমই ভক্তের পরিচালক। সেই প্রেমব্রত সাধনের জন্য শক্তির আবশ্যক। ভক্ত সেই শক্তি লাভের জন্য ঊর্দ্ধতন মহাত্মাগণে ও প্রেমব্রতের কার্য্যের জন্য নিম্নতন ব্যক্তিতে আত্ম-সমর্পণ করিতে প্রস্তুত। ঊর্দ্ধতন মহাত্মাগণের নিকট তিনি আধ্যাত্মিক শক্তি, বল ও তেজ লাভ করিবেন। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন।—

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তুবঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ গী. ৩।১১।

যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবতাদের সংবর্দ্ধন কর, তাঁহারাও তোমাদের সংবর্দ্ধন করিবেন। এইরূপে পরস্পর সংবর্দ্ধনা করিয়া মঙ্গল লাভ করিবে। এই শক্তিকামনা, তাঁহার নিজের মুক্তির জন্য নহে, নিম্নতন ব্যক্তিদের জন্য। কারণ যে পর্য্যন্ত একটি জীবাত্মাও পড়িয়া থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ভক্ত নিজের মুক্তি চাহেন না। ইহাই তাঁহার প্রার্থনা, কামনা, বাসনা ও সেবা। এই সেবা ঈশ্বরের সেবা। নিজেকে, ঐশীশক্তি চালাইবার যন্ত্রস্বরূপ করাই, তাঁহার কামনা; ঊর্দ্ধতন আলোককে নিম্নস্তরে চালাই-বার জন্য নিজেকে যন্ত্রস্বরূপ করাই তাঁহার বাসনা। নতুবা নিজে জ্যোতির্বিশিষ্ট বা দীপ্তিমান হইবার জন্য নহে। পরের মঙ্গলের জন্য, জগতের মঙ্গলের জন্য, তাঁহাকে প্রেমেই আরম্ভ করিয়া প্রেমেই শেষ করিতে হইবে, সুতরাং তাঁহাকে জগতের আধ্যাত্মিক অংশের জ্ঞান লাভ করিতেই হইবে। কারণ, তাহা না হইলে জগতের হিত সাধনের উপযুক্ত হইতে পারিবেন না। নিঃসঙ্গ হইলে চলিবে না। কারণ, তিনি নিজের মোক্ষ চাহেন না। যাহারা তাঁহার নিজের সোপানে উঠিতে পারে নাই, তাহাদের

উঠাইবার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। পার্শ্ববর্ত্তী জীবে ভালবাসা ও তাহাদের মঙ্গল সাধন হইতে প্রেম আরম্ভ, আর পরম পুরুষে আত্মসমর্পণ ইহাই শেষ। তাই বলিয়াছি ;—প্রেমেই আরম্ভ, প্রেমেই শেষ।

ভক্ত সমাজচ্যুত হইয়া নির্জ্জনে গিয়া একাকী থাকিলে চলিবে না। কারণ তাঁহাকে পরের সেবার জন্য ও পরের উন্নতির জন্য সুযোগ খুঁজিতে হইবে ; যেমন নিজের আত্মার উন্নতি করিতে হইবে, তেমনি পরেরও উন্নতি করাইতে হইবে। জ্ঞানাবলম্বীর ন্যায় তাঁহাকে নির্জ্জনে অবলম্বন-শূন্য হইয়া থাকিলে চলিবে না। জ্ঞানী ব্যক্তির সন্ন্যাস অনিত্য বিষয়ের ত্যাগ। কারণ, তাহা না হইলে তাঁহাকে বারবার জন্ম লইতে হইবে। কাজেই জ্ঞানীর সন্ন্যাস কঠোর ও শুষ্ক।

আর ভক্তের সাধনা মনুষ্যজাতির মঙ্গল কামনা, সুতরাং এই সন্ন্যাস সরস ও প্রেমের আধারস্বরূপ। জগতের কর্ম্ম করাই তাঁহার জীবনের সারব্রত। জগতের জন্যই তাঁহার জন্ম। তাঁহার নিজের জন্য কোন কর্ম্ম করিবেন না। তাঁহার মন ও ইন্দ্রিয়সকল মন ও ইন্দ্রিয়ের কাজ করিবে মাত্র, তাঁহাকে আবদ্ধ করিবে না। কর্ম্ম করা পর্য্যন্ত তাঁহার কাজ, ফলের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। কর্ম্মক্ষেত্র তাঁহার জন্য উন্মুক্ত আছে।

যে সকল মহাত্মা জগৎ পরিচালন করিতেছেন, তাঁহাদের উপর কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, কর্ম্মে আসক্ত হন না। ইহাতে যদি কোন দোষ ঘটে, কোন ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, তাহার অনিষ্টকারিতা অনেক পরিমাণে কম হয়। যদিও সেই দোষ জন্য

তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হয়, তত্রাচ তাহার পরিণাম মঙ্গলজনক। কারণ অমঙ্গল সাধন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না এবং ঐ দুঃখ তাঁহার শিক্ষক হইবে ভাবিয়া, ঐ দুঃখে বড়ই আনন্দানুভব করেন; কেন না, এই দুঃখই তাঁহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবে।

এইরূপে তিনি দিন দিন নিজ কার্য্য সাধনের নূতন নূতন উপায় দেখিতে ও শিখিতে থাকেন।

প্রথমতঃ, আমাদের প্রতিবেশীর মঙ্গলের জন্য এই মঙ্গল কামনা আরম্ভ হইবে; এমন কি, নিজগৃহ হইতে আরম্ভ হইবে। অপরের ভার লঘু করিয়া নিজে তাহা বহন করিবেন। ক্রমে সেই প্রেম সমস্ত মানবজাতির মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত হইবে। মহাপুরুষেরা ভক্তের জন্য যাহা বিধান করিবেন, তাহা তিনি নিজে ভোগ না করিয়া অপরের মঙ্গলের জন্য তাহা ব্যয় করিবেন। মহাত্মাগণ যাহা দান করেন, তাহা এক ব্যক্তির জন্য নহে, সমগ্র মানবজাতির জন্য করিয়া থাকেন। ভক্তজীবন কেবল অন্যের গুণ দেখিবেন; দোষ দেখিতে পাইবেন না, কিম্বা মহত্ত্বের দৃষ্টিতে উপেক্ষা করিবেন। নিজের ও পরের উন্নতি করিতে হইলে ভক্তি ভিন্ন অন্য উপায় নাই। যে সুর গাহিতে হইবে, তাহা ভক্তি বাঁধিয়া দিবে। বাদ্যযন্ত্র মধ্যে সুর বাঁধা যেরূপ, জীবাত্মার পক্ষে ভক্তিও সেইরূপ। হৃদয়ের সুর বাঁধাই ভক্তি। হৃদয়ের সুর বাঁধা হইলেই তাহা হইতে জ্ঞানের, প্রেমের ও পবিত্রতার বিকাশ হয়, আর তাহাতেই জাগতিক কার্য্যের সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করা যায়।

ভক্তির অর্থ—জ্ঞানচক্ষু, প্রসন্নতা এবং কীটানুকীট হইতে ঈশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত জীবে গভীর প্রেম বুঝায়। ইহাই ভক্তের

শান্তি ও মুক্তি। যখন সমস্ত জীবের মুক্তি হইবে, তখন ভক্তের মুক্তি হইবে। ভগবান বলিয়াছেন—

যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ গী ১২।৬॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ গী ১২।৭॥

যাঁহারা মৎপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তি দ্বারা কর্ম্ম সকল আমাতে অর্পণ করিয়া আমার উপাসনা করেন, হে পার্থ, সেই আমাতে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিদের মৃত্যুযুক্ত সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার করি।

এক্ষণে আমাদের দেখা উচিত যে, কোন্ পথটি সহজ এবং সাধ্যায়ত্ব। ভগবান বলিয়াছেন,—আমাতে মন সংযোগ দ্বারা জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিবে। তাহাতে অশক্ত হইলে আমার শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্বকর্ম্মের ফল ত্যাগ করিবে। যেহেতু—

শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ গী ১২।১২॥

অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যানাপেক্ষা ফলত্যাগ কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। ফলত্যাগী হইয়া কর্ম্ম করিলে জ্ঞান হয়, এবং সেই কর্ম্মে বন্ধন হয় না, ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। জ্ঞানীকেও কর্ম্ম করিতে হইবে, ইহাও প্রমাণ হইয়াছে। আর, একটিমাত্র জীব থাকিতে ভক্ত মুক্তি চাহেন না। সুতরাং ভক্ত ঘোর কর্ম্মী; অতএব নিষ্কাম কর্ম্ম আমাদের প্রধান অবলম্বন। আবার ইহাও বুঝা গেল যে, এই তিনটি পথই এক, অর্থাৎ কোন পথকেই একেবারে উপেক্ষা করিলে চলিবে না;

কোনটিই একেবারে ত্যাগ করিলে চলিবে না। ভক্তিমান্ হইয়া নিঃসঙ্গভাবে কর্ম্ম করিলে জ্ঞান ও মুক্তি হয় অর্থাৎ নির্ব্বিকার অবস্থা আসে। ভক্তি না হইলে কর্ম্ম করিবার শক্তি জন্মায় না এবং ভক্ত সর্ব্বজীবের মুক্তি না হইলে মুক্তি চাহেন না। তাই ভক্ত এত গুরু ও গরীয়ান। অতএব ভক্তের চরণে কোটী কোটী প্রণাম। নিষ্কাম কর্ম্মী ও জ্ঞানীর চরণে কোটী কোটী প্রণাম।

পরিশিষ্ট।

উক্ত তিন পথাবলম্বীরই ঈশ্বরোপাসনা কর্ত্তব্য। সকলেই ঈশ্বরোপাসক। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি বৌদ্ধ, হিন্দুর মধ্যে আবার কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, কি গাণপত্য—সকলেই সেই একমাত্র অব্যয়, নিত্য সৎস্বরূপ পরমাত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, অনেক স্থলে দ্বেষভাব দেখা যায়; ইহা কেবল বুদ্ধিভ্রমমাত্র। যখন দৃশ্যবস্তু মাত্রেই সেই ব্রহ্ম, তখন যিনি যাহাই বলিয়া ডাকুন, তাঁহাতেই পৌঁছিবে—তাঁহাকেই ডাকা হইবে। তবে উপাসকের বাসনানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির সাধনা করিতে হয় এবং প্রত্যেক কার্য্যেও তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন নামের উল্লেখ করিতে হয়। যথা—

ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনম্।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ, বিবাহে চ প্রজাপতিম্॥
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমং।
নারায়ণং তনুত্যাগে, শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে॥
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনম্।
কাননে নরসিংহঞ্চ, পাবকে জলশায়িনম্॥
জলমধ্যে বরাহঞ্চ, পর্ব্বতে রঘুনন্দনম্।
গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্॥

নানাপ্রকার দেবতার উপাসনাও তাঁহারই উপাসনা, তিনিই তৎসমুদয়ের ফলদাতা। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ গী।৭।২১॥

যে যে ভক্ত দেবতারূপ যে যে মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক উপাসনা করেন, আমি সেই সেই ব্যক্তির সেই সেই মূর্ত্তিতে তাদৃশ দৃঢ় শ্রদ্ধা বিধান করি, অর্থাৎ সে সমস্তই আমাতে পৌঁছায়, কারণ আমিই সব।

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্। গী।৯।২৩।

তবে যাঁহারা শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তিসহকারে অন্য দেবতার সাধনা করেন; তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক আমারই ভজনা করিয়া থাকেন।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্ত স্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান॥ গী।৭।২২॥

সেই ভক্ত সেই প্রকার শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই মূর্ত্তির আরাধনা করেন, পরে আমা কর্ত্তৃক বিহিত সেই সকল কামনা লাভ করেন।

আবার যে যাহার উপাসনা করে, সে সেই প্রকার গতি পাইয়া থাকে। যথা—

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।

দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ গী ৭।২৩ ॥

অল্পবুদ্ধি তাহাদের সেই ফল বিনাশশীল, দেবযাজীরা অন্তবিশিষ্ট দেবগণকে পায়, আমার ভক্তগণ আমাকে পান অর্থাৎ পরমানন্দ স্বরূপ হইয়া যান।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদযাজিনোঽপি মাম্ ॥

গী ৯।২৫॥

দেবার্চ্চনাকারীগণ দেবলোক, পিতৃগণের অর্চ্চনাকারীগণ পিতৃলোক, ভূত-পূজাকারীগণ ভূতলোক এবং আমার অর্চ্চনাকারীগণ আমাকে প্রাপ্ত হন।

আবার মনুষ্যমাত্রেই সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণবিশিষ্ট, যিনি যে গুণ-প্রধান, তিনি তদনুরূপ দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন।

যজন্তে সাত্বিকা দেবান্ যক্ষ রক্ষাংসি রাজসাঃ।

প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ গী ।১৭।৪

সাত্বিক ব্যক্তি দেবগণের, রাজসিক ব্যক্তি যক্ষ-রাক্ষসের, আর তামস ব্যক্তিগণ ভূত ও প্রেতগণের উপাসনা করিয়া থাকেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ গী ৯।২৬ ॥

যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প ফল ও জল দেন, আমি সেই সংযতাত্মা ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভক্তি পূর্ব্বক প্রদত্ত পত্র পুষ্পাদি গ্রহণ করিয়া থাকি।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্বমদর্পণম্ ॥ গী।৯।২৭॥

হে কৌন্তেয়! যাহা কিছু কর, যাহা, খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা তপস্যা কর, সমস্তই আমাতে অর্পণ কর। পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম।

কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি অন্য উপাসক, সকলেরই এই পরমাত্মার উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য। আবার বৈষ্ণবকেও প্রকৃতির উপাসনা করিতেই হইবে। কারণ শারীরিক শক্তি, জ্ঞানশক্তি বুদ্ধিশক্তি এ সমস্ত শক্তিদাতা প্রকৃতি। শক্তি ভিন্ন শক্তিদাতা অন্য কেহ নাই। সুতরাং সকলেই শক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। শক্তি চাহি না, কেহই বলেন না। ভক্ত যে এমন নিঃস্বার্থ তিনিও পরের জন্য আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রার্থী। এই প্রকৃতিও অনাদি; অতএব এই প্রকৃতির উপাসনা সকলকেই করিতে হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্ ॥
গী ১৩।১৯॥

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি; বিকার ও সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ গুণত্রয়ও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জানিবে। অতএব পরমাত্মার ও মুল প্রকৃতির উপাসনা উভয়ই কর্ত্তব্য। ঈশোপনিষদে আছে—

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য-উ সম্ভূত্যাং রতা ॥ ১২ ॥

যাহারা সেই পরমপুরুষ পরমাত্মা ভিন্ন কেবল তাঁহার শক্তি স্বরূপা-প্রকৃতির উপাসনা করেন, তাহারা তমোময় লোকে

গমন করেন ; আর যাঁহারা প্রকৃতি ভিন্ন কেবলমাত্র পরমপুরুষ হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, তাঁহারা তদপেক্ষা অধিকতর গাঢ় অন্ধকারাবৃত নরকরূপ স্থানে প্রবেশ করেন। ঈশোপনিষদে আরও আছে ;—

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুন্তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসনা ও পরমপুরুষ পরমাত্মার উপাসনা, এই উভয় উপাসনাই এক ব্যক্তির অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্ম জানিয়া, যাঁহারা উভয় উপাসনা করেন, তাঁহারা পরমপুরুষের উপাসনা দ্বারা অধর্ম্ম ও দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পান ; আর প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা অমৃত পান করিতে থাকেন।

অতএব জানি না, কেন শাক্ত ও বৈষ্ণবে দ্বেষভাব থাকে। শাক্তও বৈষ্ণব ; আর বৈষ্ণবও শাক্ত। শক্তিপ্রার্থী শাক্ত শক্তির উপাসক ; আর সত্ত্বগুণময় পরমপুরুষ বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণব।

উক্ত প্রকৃতি শক্তিই ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিনী শক্তি, সকলের নিয়ন্ত্রী ; আদ্যাশক্তি, জগন্মাতা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্তই শক্তি হইতে উৎপন্ন। আব্রহ্ম সমন্বিত অনন্ত বিশ্ব প্রসবিতার নাম সবিতা। সবিতাকে যিনি প্রসব করেন, তিনি সাবিত্রী ; তিনিই গায়ত্রী ; তিনিই আদ্যাশক্তি মূলপ্রকৃতি, ইনিই অনাদি। সৃষ্টিকর্ত্তাও এই শক্তির অধীন, এই প্রকৃতির সাহায্য ভিন্ন তিনি নিষ্ক্রিয়, সুতরাং আব্রহ্ম কীট সকলেই শাক্ত। আর সকলেই পরমাত্মার উপাসক বৈষ্ণব, ইহাতে সন্দেহ নাই।

ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি।

এই গায়ত্রীর উপাসনায় অজ্ঞানতা নষ্ট হইয়া জ্ঞানের অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতিজাত গুণত্রয় হইতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি; সুতরাং ইনিই বিশ্ব-জননী, জগন্মাতা ও ইনিই মহত্তত্ব। তাই শরীরকে গায়ত্রী বলা যায়। শরীর-রূপ গায়ত্রী অতিক্রম করিয়া প্রাণ থাকিতে পারে না। শিশুর মাতৃত্যাগের ন্যায় জীবের গায়ত্রী ত্যাগ অসম্ভব।

এই গায়ত্রী হইতে সমস্ত মন্ত্রের উৎপত্তি। গায়ত্রী জপ করিলে সকল পাপ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। মনু এই গায়ত্রী জপ দ্বারা সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্থলে পাপের গুরুত্বানুসারে জপের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। শেষে বলিয়াছেন যে,—

সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং শংসিতব্রতাঃ
বিধূত পাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্।

মনু।

যিনি নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা অর্থাৎ তিনবার সন্ধ্যার উপাসনা করেন, তিনি নিষ্পাপ হইয়া অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপং স্তিষ্ঠেন্নৈশমেনো ব্যপোহতি।
পশ্চিমাস্তু সমাসীনো মলং হন্তি দিবাকৃতং।

মনু।

প্রাতঃকালে দণ্ডায়মান হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করিলে অজ্ঞানকৃত নিশাপাপ সমুদয় ক্ষয় হয় এবং আসনে বসিয়া সায়ংসন্ধ্যার উপাসনাতে দিবসের অজ্ঞানকৃত পাপ সকল নষ্ট হইয়া থাকে।

এই গায়ত্রীর উপাসনা দ্বারা ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ গায়ত্রীর উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তি ও নিরবচ্ছেদে শান্তি।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।

ওঁ হরি ওঁ।

সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১২	৫	সুতরাং খুঁজিতেছি,	সুতরাং সুখ খুঁজিতেছি
১৭	২১	দয়ং	দয়েৎ।
১৯	২২	অধ উর্দ্ধতশ্চ	অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ।
২৫	২৩	ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।	০ ০ ০

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের

সম্বন্ধ নির্ণয় ও প্রতিকার।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

এই পুস্তকখানি সাধারণতঃ দুইখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে হোমিওপ্যাথিক ঔষধাবলীর পরস্পর সম্বন্ধ (Relation) অর্থাৎ কোন্ ঔষধটি কোন্ ঔষধের কার্য্যাবশেষ পূরক (Complementary) কোন্ ঔষধের পর কোন্‌টি ব্যবহার দূষনীয় নহে, (Follow well) ও কোন্ ঔষধটি কাহার বিষদোষনাশক (Antidote) এবং প্রচলিত যাবতীয় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কোন্‌টির ক্রিয়া কতক্ষণ স্থায়ী (Duration) ইত্যাদি চিকিৎসকের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ অতি সরলভাবে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডখানি তিন অংশে বিভক্ত করিয়া প্রথম অংশে— প্রাতঃকাল, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সন্ধ্যা, মধ্যরাত্রি প্রভৃতি দিবসের পৃথক পৃথক সময়ানুসারে প্রত্যেক ঔষধের কার্য্যকারিতা (পরিমাণ-জ্ঞাপক চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া ; দ্বিতীয় অংশে—স্পর্শন, সঞ্চালন, বিশ্রাম, উপবেশন. শয়ন. বহির্বায়ু সেবন, উত্তাপ বা শৈত্যভোগ প্রভৃতি বাহিক অবস্থানুসারে ঔষধের ক্রিয়ার হ্রাস বৃদ্ধি (Amelioration and Aggravation) এবং তৃতীয় অংশে, ঔষধাবলীর দ্বারা উৎপন্ন মানসিক প্রফুল্লতা, পরিবর্ত্তনশীল-প্রকৃতি, কাল্পনিক রুগ্নাবস্থা, অস্থিরতা, ঔদাসিন্য, অবিশ্বাস, ভয়,

উত্তম-রাহিত্য, ক্রন্দনশীলতা, রাগ, মত্ততা প্রভৃতি বহুবিধ মানসিক অবস্থা সুন্দররূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই পুস্তক সুপ্রসিদ্ধ প্রফেসর ডাক্তার, হেরিং, গারেন্সি, কেণ্ট এবং অদ্বিতীয় হোমিওপাথ্ সি, ভন, বেনিং হোসেন কৃত সর্ব্বজন-প্রশংসিত (Homœopathic Remedies &c.) পুস্তকের বঙ্গানুবাদ, সুতরাং ইহার আর অধিক পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। অতি উৎকৃষ্ট কাগজে ও পরিষ্কার নূতন অক্ষরে পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়াছে, এবং জর্ম্মান ফটো হইতে উদ্ধৃত মহাত্মা হানিমানের একখানি সুন্দর প্রতিকৃতিও দেওয়া হইয়াছে।

"সমঃ সমং সময়তি" (Similia Similibus Curantur) চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই মূলতত্ত্বের উপর, এই চিরসত্য মহাবাক্যের উপর যে চিকিৎসাশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত, তদনুসারে চিকিৎসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অকৃতকার্য্য বা আশানুরূপ ফলপ্রাপ্ত না হইবার কোন কারণই নাই। সত্য বিষয় গণিতের সূত্রের ন্যায় সকল অবস্থাতেই অভ্রান্ত। প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা-প্রণালীতেই যে কোন স্থলে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে উক্ত মূল সূত্রানুযায়ী ঔষধ প্রদত্ত হইয়া থাকে, কেবল তাহাতেই রোগ আরোগ্য হয়; অন্যথা রাশি রাশি অনির্দ্দিষ্ট ঔষধ প্রয়োগেও মূল রোগের কোন উপশম হয় না, কাজেই রোগ বৃদ্ধি ও অপব্যবহৃত ঔষধের বিষক্রিয়াজনিত বিপদজনক নূতন নূতন দুর্লক্ষণ উপস্থিত হইয়া রোগীর জীবন নষ্ট হয়। এইরূপে অনির্দ্দিষ্ট অযথা ঔষধ প্রয়োগে সামান্য পীড়াগ্রস্থ রোগীও চিকিৎসিত হইলে চিরদিনের মত তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়। "রোগ আরোগ্য ঔষধের গুণ সাপেক্ষ," তবে যে সদৃশমতে নির্ব্বাচিত প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগেও

চিকিৎসক কোন কোন সময়ে প্রথমে বিশেষ উপকার পাইয়াও অবশেষে আশানুরূপ ফল পান না; অথবা প্রথম হইতে ফললাভে বঞ্চিত হইয়া এই "অমৃত পথ প্রদর্শনী" চিকিৎসার উপর বীতশ্রদ্ধ হন, তাহা কেবল ঔষধের পরস্পর সম্বন্ধ, দিবসের বিশেষ বিশেষ সময়ে তাহাদের উপযোগিতা, মানসিক লক্ষণে ঔষধাবলীর আময়িক প্রয়োগ, এই সকল সম্যক বিদিত না থাকাই তাহার প্রধান কারণ। হয় ত প্রথমেই ঠিক ঔষধ নির্ব্বাচন করিলেন, রোগও উপশম হইল, তৎপরে কার্য্যাবশেষ পূরক বা সমশ্রেণীর ঔষধ প্রয়োগের পরিবর্ত্তে বিপরীত সম্বন্ধের বা বিষঘ্ন ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া, হয় একেবারেই রোগ আরাম হইতে দিলেন না, কিম্বা দুরারোগ্য করিয়া বসিলেন। এমনও হয় যে, ঔষধ প্রয়োগ ঠিক হইল, কিন্তু যেটি প্রাতেঃ প্রয়োগ ফলপ্রদ, সেটি সন্ধ্যার সময় প্রয়োগ করিয়া আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় ক্রমে ক্রমে ঔষধ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন, আরোগ্যের আশাও অন্তর্হিত হইল। পীড়ামাত্রেই মনকে আক্রমণ করে এবং মন অপ্রকৃতস্থ হইলেই শরীর বিকৃত হইয়া লক্ষণসমূহ শরীরে প্রকাশিত হয়, সুতরাং যদি রোগীর মানসিক ও শারীরিক লক্ষণাবলী মিলাইয়া সময় ও অবস্থানুসারে পীড়ার হ্রাস-বৃদ্ধি দৃষ্টে নির্দ্দিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারা যায়, তবে পীড়া মাত্রেই নিঃসন্দেহ আরোগ্য হইবে।

এই উপাদেয় গ্রন্থের উপযোগিতা সম্বন্ধে এক কথায় এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, এরূপ একখানি পুস্তকের সাহায্য লইয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে সদৃশ বিধানমতে অতি কঠিন ব্যাপার যে, ঔষধ নির্ব্বাচন ও প্রয়োগরূপ তাহাও, যারপরনাই সহজসাধ্য ও অল্প সময়সাপেক্ষ হইবে; এবং সাধারণ দু-

শিচকিৎস্য পীড়ার ত কথাই নাই, অম্লশূল, ওলাউঠা, যক্ষ্মা প্রভৃতি যে সমস্ত সাংঘাতিক পীড়া অচিকিৎস্য বলিয়া বিশ্বাস আছে, তাহাও সত্বর আরোগ্যে কৃতকার্য্য হইয়া সামান্য হাতুড়ে হইতে শিক্ষিত বহুদর্শী চিকিৎসক পর্য্যন্ত বিস্মিত ও বিপুল আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইবেন। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের নামাঙ্কিত মোহরাঙ্কিত আছে।

২। হোমিওপ্যাথিক মতে—

টাইফয়েড ফিবার চিকিৎসা ১০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ৮০ বার আনা। টাইফয়েড-ফিবার চিকিৎসা নাম হইলেও বিকার রোগমাত্রেরই চিকিৎসা উৎকৃষ্ট ও বিস্তারিতরূপে লেখা হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ই, বি, ন্যাস কৃত দেশবিখ্যাত অত্যুৎকৃষ্ট (Leaders is Typhoid) নামক গ্রন্থের উৎকৃষ্ট ও সরল অনুবাদ, ইহাই যথেষ্ট পরিচয়।

৩। হোমিওপ্যাথিক মতে—

বৃহৎ নিউমোনিয়া সন্দর্ভ রিপারিটারি সমেত, মূল্য ২।০ আড়াই টাকা। ৫৩৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। নিউমোনিয়া নাম হইলেও ইহাতে সমস্ত ফুস্‌ফুস্ রোগের উৎকৃষ্ট ও বিস্তারিত চিকিৎসা লেখা হইয়াছে। ইহা পাঠে বক্ষঃরোগী মাত্রকেই যমের মুখ হইতে কাড়িয়া আনিবার অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মিবে। এরূপ উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ পুস্তক এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। যিনি এই পুস্তকখানি লইবেন, তিনি "প্লেগ-চিকিৎসা রিপারিটারি" সমেত, বিনামূল্যে অর্থাৎ উপহার পাইবেন।

৪। হোমিওপ্যাথিক মতে—

প্লেগ-চিকিৎসা রিপারিটারি সমেত ১৫৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ৸৹ বার আনা।

৫। হোমিওপ্যাথিক মতে—

ওলাউঠা-বিজয় রিপারিটারি সমেত (যন্ত্রস্থ), মূল্য ১৲ এক টাকা। নাম লিখিয়া অগ্রিম গ্রাহক হইলে ৷৹ আট আনায় পাইবেন।

৬। হোমিওপ্যাথিক মতে—

সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্য-রত্ন রিপারিটারি সমেত তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে (যন্ত্রস্থ)। মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা। নাম লিখিয়া গ্রাহক হইলে ৩৲ তিন টাকায় পাইবেন।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ৮৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ৷৹ আট আনা।

৭। হোমিওপ্যাথিক ব্যবস্থাসোপান, মূল্য ৴৹ এক আনা।

৮। স্ত্রীর প্রতি উপদেশ বা তখনি তুমি দেবী, মূল্য ৵৹ দুই আনা। স্ত্রীকে যদি দেবী করিতে চাহেন, তবে দেবী পড়িতে দিউন।

ভগবান ৺ শ্রীশঙ্করাচার্য্য কৃত—

৯। আত্মানাত্ম বিবেকঃ মূল ও বঙ্গানুবাদ, মূল্য ।• চারি আনা। ইহা পাঠে নিতান্ত অজ্ঞানীরও আত্ম ও অনাত্ম বিষয়ে জ্ঞান জন্মায়, এবং অপার আনন্দ লাভ হয়।

১০। ধর্ম্মের তিনটি পথ। মূল্য ৶৹ দুই আনা।

তিনটি পথ পাঠ করিলে প্রকৃত পথ পাওয়া যায়। আজকাল অনেকেই ধর্ম্মপুস্তক মধ্যে গুপ্তবিষয় সকলের ভাবার্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন; বুঝিতে না পারিলে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। এই অভাব পূরণই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ভারতে নূতন না হইলেও অনেকে ইহার নূতনত্ব অনুভব করিয়া আনন্দিত হইবেন।

১১। মোহমুদ্গার. মূল্য /৫ পাঁচ পয়সা।

ইহা প্রকৃতই মোহমুদ্গার। ইহা পাঠ করিলে নিতান্ত অজ্ঞানীরও হৃদয় একবারও আত্মতত্ত্বের অন্বেষণে ব্যস্ত হয়।

১২। বাণ-যুদ্ধ মূল ও বঙ্গানুবাদ, মূল্য ৶৹ দুই আনা।

ইহা পাঠ বা শ্রবণে জ্বর রোগ আরোগ্য হয়। ইহা রোগীগণের যেমন প্রাণদাতা, যোগীগণের যোগশিক্ষাবিষয়ে তেমনি সমাধিদাতা। সামান্য সামান্য জ্বর এবং পুরাতন জ্বর ইহা শ্রবণে আরোগ্য হইয়া যায়। সামান্য জ্বরে যাঁহারা বহু অর্থ ব্যয়ে ঔষধনামধারী নানা প্রকার বিষপানে দেহকে পুরাতন রোগের আকর করিয়া ফেলেন, তাঁহারা ৩ দিন বা ৭ দিন ইহার মূল পাঠ করিয়া দেখুন।

বিশেষ সুবিধা।

যিনি বৃহৎ নিউমোনিয়া-সন্দর্ভ ক্রয় করিবেন, তিনি "প্লেগ-চিকিৎসা" বিনামূল্যে উপহার পাইবেন।

যিনি আত্মানাত্ম বিবেকঃ ও স্ত্রীর প্রতি উপদেশ একত্রে লইবেন, তিনি "মোহ-মুদ্গার" উপহার পাইবেন।

আর যিনি সমস্ত পুস্তকগুলি লইবেন, তিনি "প্লেগ-চিকিৎসা," "মোহ-মুদ্গার" ও "বাণ-যুদ্ধ" উপহার পাইবেন।

তিনটি পথ মূল্য ৵০ দুই আনা। ইহার মূল্য যথাসাধ্য অল্প করা হইয়াছে; আবার নয়খানি লইলে ১৲ এক টাকায় পাইবেন।

চক্ষু-জীবন।

চক্ষু উঠার অব্যর্থ-মহৌষধ।

এক দিনেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে—পরদিন আর কোন যন্ত্রণা থাকিবে না। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

স্পিরিট ক্যাম্ফর।

ওলাউঠার মহৌষধ। এক শিশির মূল্য ৷৷০ আট আনা।

প্রাণরক্ষার জন্য প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে এক এক শিশি থাকা উচিত।

দাদ-মার্জ্জন।

এক সপ্তাহ মধ্যে দাদ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। এক কৌটার মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।